নিমিত্তমাত্র

আশাপূর্ণা দেবী

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৩৬১ সন
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
হাওড়া-৪
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীকিঙ্কর কুমার নায়ক
নায়ক প্রিণ্টার্স
৮১/১-ই. রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা-৬।

স্নেহের শ্রীমান আশিস্ সরস্বতী
স্নেহের শ্রীমতী গোপা সরস্বতী
কল্যাণীয়েষু

আমাদের প্রকাশিত এই লেখিকার অন্যান্য বই

কখনও কাছে, কখনও দূরে

মজারু মামা

নিমিত্তমাত্র

আমাদের এই তিনশো বছরের কলকাতার অনেক ঐশ্বর্য, অনেক গৌরব। কলকাতা যে তিনশো বছরে পা ফেলেছে, এই দেমাকেই ডগমগ! তবু এ কলকাতার আকাশে আতঙ্ক, বাতাসে আতঙ্ক। নিশ্চিন্ততাহীন নিরাপত্তাহীন এ কলকাতা তাই যেন ভালবাসা শব্দটা ভুলতে বসেছে। ভুলতে বসেছে মায়া মমতা দয়া করুণা। সর্বদা ভয় আর অবিশ্বাস নিয়ে তার ঘরকন্না।

কিন্তু বছর আড়াইশোর কলকাতার বাতাস এমন ভারাক্রান্ত ছিল না। তখনও কলকাতার বাসিন্দাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসটা অন্তত সহজ খাতেই বইত। সে কলকাতার মোটামুটি গেরস্থ ঘরে 'সদর' 'অন্দরে' একটা ভেদ থাকত বটে, কিন্তু 'সদর দরজা'টা নিয়ে কড়াকড়ির বাড়াবাড়ি ছিল না। সারাক্ষণ সদরের খিল ছিটকিনি টাইট রাখা হবে এমন দৃশ্যও দেখা যেত না।

অবশ্য বড় মানুষদের কথা আলাদা।

যাদের দেউড়িশোভিত বাড়ি, তাদের দেউড়িটি দারোয়ানশোভিত থাকবে, এটা তো স্বাভাবিকই। সে দেউড়িতে ফালতু লোকেরা সহজে মাথা গলাতে পারত না। তবে সেটা আতঙ্কে নয়, অবিশ্বাসেও নয়, সেটা হচ্ছে বড়মানুষির কায়দা। যে আসবে তাকেই ঢুকতে দিতে হবে না কি? এত্তালা দেবে, জানান দেবে, আসার কারণ দর্শাবে তবে তো।

তো সেটা তো আতঙ্কের পরিচয় নয়, অহঙ্কারের অলঙ্কার।

কথা হচ্ছিল গেরস্থজনেদের।

যে রকম গেরস্থদের বাড়ির বুড়িটা হটরা পিটে নিত্য গঙ্গাস্নানে যায়, কালী-শীতলা করে বেড়ায়, অথচ বাকি মহিলাদের বেশ একটু আব্রু মেনে চলতেই হয়। যে সব বাড়ির কর্তা পুরুষরা সকালে উঠে

নাপিতের কাছে দাড়ি কাটে, বাজারে ছোটে, অথচ বাজারে গিয়ে চেনালোক দেখলে গল্পে জমে গিয়ে অফিসের দেরি করে বসে।

যদিও তারপর দুটো নাকেমুখে গুঁজে অফিস ছোটে, 'কৈ-মাছ ইলিশ মাছ তুলে রেখে দাও ওবেলা খাব' বলে তবু তাদের জীবন-তরীখানা যেন বেশ একটু মন্দাক্রান্তা তালেই চলত।

সে সব বাড়িতে ছেলেমেয়েরাও ইস্কুল যেত গয়ংগচ্ছ তালেই। বেলা দশটা সাড়ে দশটার আগে তো আর ইস্কুল নেই কারো। বাদে বড়লোকদের ছেলেদের। তাদের হয়ত অন্য প্যাটার্ন। গেরস্থ ঘরের ছেলেপুলেরা কেউ ছটায় ছুটছে, কেউ নটায় ছুটছে, কেউ বেলা একটায় ফিরে বেলা দুটোয় 'লাঞ্চ' করছে, এমন বড় একটা হতে দেখা যেত না। এবং বছর দুইয়ের ছেলেটাকেও নড়া ধরে তুলে ঘুম ভাঙিয়ে স্কুল ইউনিফর্ম পরাতে বসাবার কথা জানতও না তাদের মা।

ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা যে তাদের মায়েদেরই পরীক্ষা এমন ধারণাও চালু হয়নি তখন আজকের মতো। বহিরঙ্গের অসংখ্য আতঙ্কর সঙ্গে শিশু সন্তানটির পরীক্ষার চিন্তায় আতঙ্ক কণ্টকিত হয়ে থাকত না মায়েরা। তবে তখনকার ছেলেপুলেরা কি আর মানুষ হয়নি? সে যাক সে অন্য ফিরিস্তি। কথা হচ্ছিল সদর দরজার কড়াকড়ি নিয়ে।

না, সে কলকাতার দরজার কড়াকড়ির এমন বাড়াবাড়ি ছিল না। কিছু বালখিল্য বাহিনী তো বাড়িতে থাকবেই। কাজেই বাড়ির বাবুদের অনুপস্থিতিতে বাড়ির সদরটি থাকত তাদেরই দখলে। তারা হয়ত সদরের সামনে লাট্টু ঘোরাচ্ছে, কিম্বা গাব্বু খুঁড়ে মারবেল খেলছে, নয়ত ডাংগুলি খেলছে।

কাজেই 'সদর দরজা' নামক বস্তুটি অবারিতই থাকে।

কিন্তু তারা যখন বাড়ির মধ্যে ঢুকে আসে?

তখন অবশ্য দরজায় খিল পড়ে। তবে দরজায় কড়ানাড়ার ধ্বনি ধ্বনিত হলে তারাই ছুটে এসে দরজা খুলে দেবে, এই নীতিই বলবত। খিল পর্যন্ত যার হাত পেঁৗছয় না, সেও ডিঙি মেরে, বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে ওই দুরূহ কাজটি করতে মহোৎসাহে ছুটে আসবে।

এ বিষয়ে কোন নিষেধবাণী ছিল না তাদের ওপর।

কড়া নাড়ার শব্দ হবে আর দরজা খোলা হবে না? এ আবার হয় না কি? অতএব আগে কেবা প্রাণ, করিবেক দান, তারই লাগি কাড়াকাড়ি।

আর কর্তা পুরুষরা যতক্ষণ বাড়িতে উপস্থিত ততক্ষণ তো সদরে খিল পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। কেন উঠবে? বাড়িতে পুরুষরা থাকতে ভয়টা কী?

তা তখন একাধিক কর্তা পুরুষ তো একই সংসারে উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ বিরাজ করতেন। কাজেই খিল পড়লে চলবেই বা কেন? একাধিক কর্তাজনের নিজস্ব প্রয়োজনে 'প্রবেশ-প্রস্থান' আছে না? তাছাড়া—প্রশ্ন থাকে না গোয়ালা দুধ দিতে আসার অথবা গরু নিয়ে সামনে দুধ দোহাতে আসার! প্রশ্ন থাকে না ঠিকে বাসন মাজুনির মর্জিমত সময়ে আসা যাওয়ার? আর ঠাকুর চাকরের হরদম দোকানে যাওয়ার!

বড় সংসারে নানা জনের নানা ফরমাশ তো থাকবেই। তা নেহাত গরিবগুর্বো না হলে, মোটামুটি গেরস্থ ঘরে, ঠাকুর চাকর নামক জীব দুটো থাকতই প্রায়। সে সংসারের হাঁড়ি ঠেলাটি তো সহজ নয়! মাসে গোটা দশ-বারোটা টাকা আর দু'বেলা সেই বৃহৎ হাঁড়ির চারটি ভাতের বদলে যদি বাড়ির মহিলাদের প্রাণটা বাঁচে, অফিস বাবুদের যথা সময়ে ভাতটা জোটে, এবং কাচ্চা বাচ্চাদের 'ম্যাওয়ের' দায়টা খানিক কমে, খরচে পারলে সেটুকু করা হবে বৈকি!

'ভাতটি' অবশ্য 'নেহাত চারটি' নয়, বেশ 'কিছুটি'ই। তা তাতেই বা কী? ভাতের আর কতই বা দাম?

ঠাকুর চাকররাও অবশ্য দুপুরের পাট চুকলেই দ্বিপ্রাহরিক আড্ডা দিতে বেরিয়ে পড়বেই।

তখন, সেই দুপুরের সময়টিতেই সদরে কিছুক্ষণ ভালভাবে খিল পড়ত। তবে এমনও কি হত না—বেশি বৃষ্টির সময় কোনও পথচারীকে মাথা বাঁচাতে দিতে অথবা চড়া রোদের সময় দু'একটা

অভাজনকে একটু ছায়াশীতল ঠাঁই দিতে, সে খিল খুলে তাদেরকে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া? হত বৈকি। হয়তো সেই তাদের প্রার্থনায়। হয়তো বা গৃহস্থের মানবিকতায়। স্বেচ্ছায় ডাক দেওয়ার দৃশ্য বিরল ছিল না, 'দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজে সারা হচ্ছ যে বাপু। ভেতরে ঢুকে এসে বস।'

তা'বলে কি আর বৈঠকখানা ঘরে এসে বসতে বলা হত? সিঁড়ির তলায় টলায়, বা প্রবেশ পথের চত্বরেই।

রোদে বৃষ্টিতে, হয়ত কোনও একটা 'ছাতা সারাইওলা' কি 'শিল-কাটাইওলা' তাদের সরঞ্জাম নিয়ে, কিংবা একটা শিশিবোতলওলা তার বস্তার বোঝা নামিয়ে বাড়ির দরজার মধ্যে ঢুকে আশ্রয় নিয়ে বসে আছে, এ দৃশ্য এখনও চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

সন্দেহ? আতঙ্ক?

কই? মনে তো পড়ে না।

কলকাতার আড়াইশো বছর বয়েস পর্যন্ত মোটামুটি মধ্যবিত্ত পাড়ার মোটামুটি ছবি এই রকমই ছিল!

তবে সেটি হচ্ছে আসল খাস কলকাতা। বনেদি কলকাতা! তা হলেও—অর্বাচীন কলকাতাতেও অর্থাৎ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে এগিয়ে আসা কলকাতাতেও কখনও অহেতুক আতঙ্ক আর সন্দেহের চাষ ছিল না।

কিন্তু তিনশো বছরে এসে পৌঁছনো কলকাতার ছবি? পাল্টে বসেছে মোক্ষমভাবে। এখন আর কেউ অমন বোকাটে মানবিকতা দেখাতে বসবার কথা ভাববে না! কারণ এ কলকাতার আকাশে আতঙ্ক বাতাসে আতঙ্ক। 'বিশ্বাস' 'নিশ্চিন্ততা' 'নির্দ্বিধা' এসব শব্দগুলো যে "আউট অফ মার্কেট" হয়ে গেছে এখন।

এখন তাই সদর দরজা নিয়ে বড় কড়াকড়ি। যেন দরজার বাইরে কে ছুরি শানিয়ে ওত পেতে বসে আছে, খোলা পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

তাই সদা সতর্কতা।

নিশ্চিত নিয়মে সম্ভাবিত লোক এসেছে বুঝেও দরজার কড়াটা হঠাৎ বেজে উঠলে, বা ডোর বেলটা বেজে উঠলে, বারান্দা কি জানলা দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখে, জিজ্ঞাসাবাদ করে একশো পার্সেন্ট নিশ্চিত হয়ে তবে গাড়ির হৃদয় দরজাটি খুলে ধরা হয়।

দোরে নাড়া পড়লেই দুম করে খুলে বসব? পাগল নাকি?

তবে কিনা 'সাবধানের যেমন বিনাশ নেই' তেমনি 'বিনাশেরও সাবধান নেই।' 'লোহার বাসরে'ও তো সাপ ঢুকে বসে?'

যেমন আজ মৃগাঙ্ক মৌলিকের বাড়িতে ঢুকে বসল।

রোদ নয় বৃষ্টি নয় এবং লোডশেডিংও নয়, সদ্য সন্ধ্যার তারা ফোটা আকাশ, আলো ভরা রাস্তা। রাস্তার ওপরেই বাড়ি।

দোতলার বারান্দা থেকে কোনাকুনি রাস্তার ওপারে—করঙ্ককে তার অফিস ব্যাগ হাতে নিয়ে 'অফিস মার্কা' চাটার্ড বাস থেকে নামতে দেখেই সুরভি যথারীতি বারান্দা থেকে সরে এসে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সদর দরজাটা খুলে ধরেছে মাত্র, ঝড়ের বেগে ছুটে এসে একটা লোক খোলা দরজার মধ্যে ঢুকে পড়ে ছিটকিনিটা আটকে দিয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে থাকে।

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে ওঠে সুরভি, কে? কে?'

লোকটাও সেই সঙ্গে একটা চাপা আর্তনাদের গলায় বলে ওঠে, 'আমারে বাঁচান দিদি! ধরত্যে আসতেছে। খুন করে ফেলাইবে।'

জোর পাওয়ারের আলো জ্বলছে, তাই এক নজরেই লোকটার আপাদমস্তক স্পষ্ট দেখতে পায় সুরভি।

মাঝারি গোছের বয়েস, মাথায় কদমছাঁট চুল, খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি, পরনে একটা বিবর্ণ লুঙ্গি, বুকের বোতাম খোলা একটা হাফহাতা শার্ট, সেও বর্ণবিবর্ণ, কাঁধে একটা গামছা।

আর বগলদাবায় একটা ছোট পুঁটুলি।

তার মানে মূর্তিমান বিভীষিকা।

তার মানে মৃত্যুর পরোয়ানা।

যদিও 'পুরুষ মানেই ভরসা'। এ যুগে আর তেমন বিশ্বাস নেই। বিভীষিকার প্রতীকের সামনে সবাই সমান। তবু সুরভির মনে হল করঙ্ক এসে পড়লে ভরসা।

কিন্তু লোকটা সেই আসার পথটা চেপে দাঁড়িয়ে আছে।

তাই বলে ওঠে, 'কে তুমি? দরজা ছেড়ে দাও। বাবু আসছেন।'

খুব সহজে বলে না অবশ্য, আপ্রাণ চেষ্টায় বলে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ চিৎকারে বলে ওঠে, 'বাবা! দেখুন। কে একজন লোক ঢুকে পড়ে—'

এত ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও কে 'একটা লোক' না বলে 'একজন' লোক বলে। হ্যানস্থা প্রকাশে যদি ক্ষেপে গিয়ে লোকটা—ওঃ!

'বাবা' অর্থাৎ মৃগাঙ্কমোহনও এতক্ষণ বারান্দায় তাঁর পুত্রের আবির্ভাব দৃশ্যটি দেখবার জন্য বৌমার পাশে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করছিলেন, এবং সে দৃশ্যটি দেখার পরই সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির দিকে এগিয়েও এসেছিলেন ···হঠাৎ এরকম বিজাতীয় ধ্বনির ধাক্কায় প্রায় ছিটকে সরে এসে সিঁড়ির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন, 'কী হল! অ্যাঁ? বৌমা!'

বলতে বলতেই চটি ফটফটিয়ে নেমে আসতেও থাকেন। হত্যবসরে শুনতে পাওয়া যায় অসহিষ্ণু ভঙ্গির 'বেল' বেজে ওঠা।

তা অসহিষ্ণু তো হবেই। মানুষটা বাস থেকে নেমেই চোখ তুলে অপেক্ষারত বাবা ও বৌয়ের দাঁড়িয়ে থাকার পরিচিত দৃশ্যটি দেখে সহর্ষচিত্তে চলে আসছে, অথচ এসে দেখে কিনা কপাট আঁটা। মাত্র রাস্তাটুকু পার হতে এমন কী ঘটনা ঘটল যে, এমন অদ্ভুত অবস্থা! তাও বেল বাজানো সত্ত্বেও দোর খুলে পড়ছে না! মানে?

মৃগাঙ্কও নেমে এসে দরজায় পিঠচাপা মূর্তিটিকে দেখে শিহরিত হন। এবং তিনিও আর্তনাদের মতই বলে ওঠেন, 'কে? কে তুমি? দরজা ছাড়ো। বাড়ির লোক ঢুকতে আসছে।'

লোকটা কাতর ভঙ্গি করে বলে, 'না বাবু. আমারে ধরতে আসতেছে।'

'কে? কে ধরতে আসছে?'

'ওই ওরা! মেরে ফ্যালাইবে।'

লোকটা হাঁপাতে থাকে। সত্যিই প্রাণভয়ে ভীত, না অভিনয় ভগবান জানেন। মানুষকে বিশ্বাস নেই।

ওদিকে দরজার বেল তখন মিনিবাসের সাইরেন তুল্য হয়ে উঠেছে, এবং তার সঙ্গে দরজায় ধাক্কা এবং অস্থির প্রশ্ন, কী আশ্চর্য! হচ্ছে কী ভেতরে? দোর খোল।

অস্থির আর আশ্চর্য হবে না? ভেতরে বাবার গলার স্বর শোনা যাচ্ছে, অথচ দরজা টাইট!

মৃগাঙ্ক তাকিয়ে দেখেন, লোকটার হাতে ছুরিছোরা আছে কি না। দেখা যাচ্ছে না বটে কিন্তু বগলের ওই গামছার পুঁটলিটা? কী আছে ওতে? বুকের মধ্যে ড্রাম পিটবে না? তবে এদিকে তাকিয়ে দেখেন নীচে নেমে এসেছে সবাণী, নেমে এসেছে আকাশ আর আলো।

কেউই অবশ্য গুণ্ডা ঠেকাবার ভূমিকায় নেমে পড়তে পারবে, এমন আশা করবার নয়, তবু গোটা অনেক মানুষের উপস্থিতি তো! যা বুকে বল এনে দেয়। মৃগাঙ্ক অতএব জোর করে আত্মস্থের গলায় বললেন, 'আমার ছেলে আফিস থেকে ফিরেছে, ঢুকতে পাচ্ছে না। বেশি হয়ে করোতো পুলিশ ডাকব!'

হ্যাঁ, এখনও 'বিপদে মধুসূদনে'র মতো পুলিশ শব্দটাই উচ্চারণ করে লোকে। কীই বা করবে? ইহসংসারে নাম হিসেবেই বা রক্ষাকর্তা আর আছে কে?

লোকটা এখন একটু সরে এল, হাত উঁচিয়ে ছিটকিনিটা নামিয়ে দিয়ে আর সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে এল করঙ্ক তার অফিসব্যাগটা হাতে নিয়ে।

ঢুকে এসে হতচকিত হয়ে পরিস্থিতিটার দিকে তাকিয়ে দেখল। কোনও নাটকের একটা দৃশ্য দেখছে নাকি?

লোকটা আবার আঁতকায়, 'দরজায় 'লক' দিয়ে দিন বাবু। এক্ষুনি ওরা ঢুকে পড়বে।'

'ওরা' ঢুকে পড়বে। এটা তো আরও ভয়ঙ্কর বার্তা। 'রা' কী সাংঘাতিক। এতো তবু একটা। অতএব সত্যিই করঙ্ক ওই লোকটার নির্দেশটা মানে। অতঃপর ফিরে দাঁড়িয়ে ভারি গলায় বলে, ব্যাপারটা কী বাবা?

অতএব ব্যাপারটা বোঝাতে তৎপর হন বাবা। তবে সঙ্গে সঙ্গে 'বাবার বৌমা'ও। তার সঙ্গে লোকটাও। সব মিলিয়ে—যা দাঁড়ায় সেটা তো বেশ ভরসাদায়ক নয়। তবে ভরসার মধ্যে এখনও পর্যন্ত অন্তত লোকটা হিংস্রমূর্তি ধরেনি. এবং ছোরাছুরি বার করেও লোফালুফি করেনি। কিন্তু—লোকটা যে গুণ্ডা তাতেও তো আর সন্দেহ থাকতে পারে না। ওর আপাদমস্তক সবটাই তো সেই সাক্ষ্য বহন করছে।

তবে ভাঙা ভাঙা অজস্র প্রশ্নোত্তরের মধ্যে তার রচিত এই 'গপ্‌পো'টি পাওয়া যাচ্ছে, লোকটা 'ফুটপাথের বাসিন্দা' জাতের একজন। তো হঠাৎ নতুন একটা বদমাশ লোক তার অংশের ফুটপাথের দখল নিয়ে আসায় ঝগড়া বাধে, এবং স্বভাবতই ঝগড়ার ক্ষেত্রে যা হয়—দুটো দল হয়ে যায়। এই লোকটার বিপক্ষ দল তার ওপর হামলা করে ছুরি বার করে বসে, লোকটা অতএব দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালাতে পালাতে এই বাড়িটার দরজা খোলা দেখেই ঢুকে পড়ে। গপপো এই। অতঃপর আবেদন এই রাতটুকু যদি তাকে এখানে একটু আশ্রয় দেন বাবুরা। সকাল হলেই হল্লা মিটে যাবে, যে যার পেটের ধান্দায় এদিক ওদিক ছড়িয়ে যাবে। তখন পথে বেরোতে ভয় থাকবে না। হয়তো বা প্রতিপক্ষের সঙ্গে সমঝোতাতেই এসে যাবে।...

'কিন্তুক্ এখন তো বাবু ওরা মারমুখি, আমারে হাতে পেলে চামড়া ছাড়িয়ে নেবে।'

তা গপ্‌পোটি বেশ ঠাসবুনুনিই। কিন্তু তা'তে তো আর তিনশ বছরের কলকাতার মন ভেজে না। এতো আর মৃগাঙ্কর জ্যাঠা ঠাকুর্দার আমল নয়।

করঙ্ক তার স্ত্রী কন্যা জননীকে হাতের ইশারায় সরে যেতে বলে,

গম্ভীর গলায় বলে, সেটা কী করে সম্ভব তুমিই বলো বাপু। দিনকাল কেমন তা জানো না?

মৃগাঙ্কও ব্যস্ত গলায় বলে ওঠেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকের দিনকালে কেউ একটা অজানা লোককে আশ্রয় দেয় এমন দেখেছো বাপু? অসম্ভব!

বাপ বেটা দুজনেই সমস্বরে বলেন, না না, অসম্ভব।

কাকুতি মিনতিই চালাচ্ছে যখন লোকটা, তখন বুকের মধ্যেকার ড্রাম বাজাটা কিছুটা কমে, হাত-পা হিম হওয়াটা কিছুটা প্রশমিত হয়।

কাজেই জোর গলায় বলে ওঠা যায়, পথ দেখো বাবু, ওসব হবে না।

আমারে বিশ্বাস করেন বাবু, আমি—

দেখ, এ যুগে আর ওসব বিশ্বাস টিশ্বাসের কথা ওঠে না। মাপ কর বাবা। বল তো না হয় কিছু দিচ্ছি, বাইরে গিয়ে একটু চা ফা খেয়ে নাও গে।

এটা একরকম টোপ। দুটো টাকার লোভ দেখিয়ে যদি লোকটাকে ভাগানো যায়। তো একথা শুনে লোকটা একটু হাসল। হাসিটা অবশ্য বেশ ভয়াবহ। কারণ এরা দেখছিলেন লোকটার পুরো গুণ্ডামার্কা চেহারা, এ লোক নিরীহ হতে পারে না। সামনের একটা দাঁত ভাঙা, তাই হাসিটা আরও বিচ্ছিরি দেখতে লাগে।

লোকটা হেসে বলে, নাঃ। কিছু দেবার লাগবে না। রাতের মতো একটু আশ্রয় পেলে—

'তা' তুমি যদি একটা অসম্ভব আবদার করে বস বাপু, কী করা যাবে।'

তখন লোকটা আর একটা অদ্ভুত আবদার করে। তাকে নাহোক তার সঙ্গের এই পুঁটুলিটিকেই তাহলে রাতের মতো একটু আশ্রয় দিন বাবুরা। আজ রেখে যাবে, কাল সকালে এসে নিয়ে যাবে।

তো এতেও প্রবল আপত্তি উঠবে বৈ কি। এটাই কি ন্যায্য কথা?

না না। জিনিস ফিনিস রাখা টাখা চলবে না। তোমার পুঁটুলি নিয়ে সরে পড়।

তবু নাছোড়বান্দা লোকটা হাতে পায়ে ধরে। এট্টা ছেঁড়া গামছার পুঁটুলি, এতে আর আপনাদের কী ক্ষেতি করবে বাবু?

করঙ্ক রেগে উঠে বলে, করবে না তার গ্যারান্টি কী? ওর মধ্যে কী আছে না আছে জানি? ধর যদি বোমাই থাকে!

লোকটা আর একটু হাসে। অথবা হেসে ওঠেই বলা উচিত। বোমা! দাদাবাবুর কথা শুনে হাসব না কাঁদব? ছ'খান লুঙ্গি আর দুটো ছেড়া গেঞ্জি—

বলেই পুঁটুলির গিঁটটা খোলে।

ঠিক আছে। ঠিক আছে। দেখাতে হবে না। রাখাও চলবে না। বেশি ইয়ে কর তো বাপু, আমায় পুলিশ ডাকতেই হবে।

কিন্তু এমন নেই আঁকড়া লোক যে পা ধরতে আসে। আপনার ঘুঁটেকাঠের বস্তার কাছে কোথাও গুঁজে রেখে দ্যান বাবু—

ঘুঁটেকাঠ আবার কোথায়?

তবে বাড়ির বাজে জঞ্জালের মধ্যে কোথাও রাখেন। সক্কাল বেলাই নে যাব।

নাঃ, এ লোককে তো নড়ানো যাচ্ছে না।

এদিকে রাত বেড়ে উঠেছে। আর যে লোকটা তেতেপুড়ে সারাদিন পর বাড়ি ফিরেছে, তার হাতে মুখে একটু জল পড়ল না এখনও। মা বৌ দুয়েরই তো প্রাণ কাঁদছে।

তাঁদের সরে যেতে বলা হয়েছিল বলে সত্যিই তো আর রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে একেবারে গ্রিনরুমে চলে যাননি। উইংসের আড়ালেই অপেক্ষা করছেন। অর্থাৎ সিঁড়ির মাথায়।

এখন সুরভি মুখটা একটু ঝুলিয়ে বলে ওঠে, বাবা! ওই পুঁটুলিটা একটু ভাল করে সাচ করে না হয় রেখেই দিন। কতক্ষণ আর এই যুদ্ধ চলবে?

তা একরকম যুদ্ধই বৈ কি।

একপক্ষের আপ্রাণ চেষ্টা, আর অপরপক্ষের আপ্রাণ প্রতিরোধ।

আকাশ যেহেতু মহিলাদের দলে পড়ে না, তাই সে চলে যাবার

ইশারাটা গায়ে মাখেনি। নাটকটি দেখে চলছিল। এখন বলে ওঠে, তাই কর দাদু! বাবাঃ! আর পারা যাচ্ছে না।

দেখ বাপু, কোন চোরাই মালটাল নেই তো?

মা কালীর দিব্যি বাবু।

মা কালীর দিব্যি! মুহূর্তে মনটা কিঞ্চিৎ শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ে। কারণটা যাই হোক। হয়তো যে সন্দেহটি মনের মধ্যে পাক খাচ্ছিল যাকগে, থাক সে কথা। তেমন সন্দেহজনক নয় যখন।

আকাশ তোড়া দিয়ে বলে, খোল না।

আসলে তার কৌতূহলটা প্রবল হয়ে উঠেছে।

লোকটা খোলে। আর পাটকরা গেঞ্জিটা তুলতেই চোখে পড়ে, ছোট্ট একখানা কালীঠাকুরের পট। কালীঘাটের কালীর মতো। তার নীচে পাটকরা বোধহয় খানদুই লুঙ্গি আর জামাটামা কিছু।

কিন্তু শেষ তলানি পর্যন্ত আর দেখা হয় না। শিথিল হয়ে যাওয়া মন প্রায় ঝুলেই পড়ে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। হয়েছে। ওই দেয়ালের কাছে রাখ। এই যে এখানে—

আর ঠিক এই মহা মুহূর্তে লোডশেডিং হয়ে যায়। আর যা হয়। প্রথমটা একটা নিঃসীম অন্ধকার।

সকলেই একসঙ্গে কেমন যেন একটা অস্ফুট শব্দ করে ওঠে। অতঃপর করঙ্ক আন্দাজেই বলে ওঠে, এই দেয়াল ধারে রেখে দিয়ে কেটে পড় বাপু। দরজা বন্ধ করি।

কোনও সাড়া মেলে না।

মৃগাঙ্ক চেঁচিয়ে ওঠেন, আলো, টর্চটা নিয়ে আয় তো—

কই হে, কোথায় রাখছ?

সাড়া নেই!

আলো টর্চ নিয়ে নেমে আসে। নেমে আসে সুরভিও। এবং সর্বাণীও।

কী হল? লোকটা উপে গেল নাকি?

টর্চ ধরে দেখা গেল উপে যায়নি, দরজা খুলেই বেরিয়ে গেছে।

কিন্তু কী নিঃশব্দে আর কী ফস করে। বেরোচ্ছে বোঝাই গেল না। অথচ ছিটকিনিটা তো খুলেছে।

আশ্চর্য। জিনিসটা রাখল, না--নিয়েই চলে গেল?

না, তা যায়নি। দেয়াল ধারে রেখেই গেছে।

* * *

আশ্চর্য, এমন মোক্ষম সময় লোডশেডিংটা হল।

লোডশেডিংটি তো মোক্ষম মোক্ষম সময়েই হয় দাদু!

কিন্তু ওভাবে নিঃশব্দে সরে পড়ার মানে কী?

মানে আর কী! যে সব গপ্পো শুনিয়ে গেল নিশ্চয় ভাঁওতা! অন্য ব্যাপার আছে।

বাড়ির ছ'জন সদস্য। নিজ নিজ অনুমান অনুসারে সেই ব্যাপারের হদিশ করার চেষ্টা করে চলে।

* * *

হ্যাঁ, ছয় সদস্যের সংসার!

সেকালের ধাঁচে পরিচয় দিতে হলে, বলতে পারা যেত 'কর্তা-গিন্নি, ছেলে-বৌ, নাতি-নাতনি।' সাকুল্যে এই ছয়. তবে এ যুগে পরিচয় লিপির ধাঁচটা একটু পালটেছে, সেই অনুসারে বলা উচিত, 'স্বামী-স্ত্রী, মা-বাপ, ছেলে-মেয়ে।'

তা বলাটা যে ভাবেই হোক, স্বীকার করতেই হবে, এ যুগের আর পাঁচটা সংসারের তুলনায় বেশ সুখি সংসার।

বাড়িখানা অবশ্য মৃগাঙ্ক মৌলিকেরই তৈরি। অবসর গ্রহণের কালে একসঙ্গে যে সব টাকাকড়ি হাতে এসেছিল, তার সঙ্গে সারাজীবনের সঞ্চয় সমূহ এমন কি ম্যাচিওর হয়ে যাওয়া একটা লাইফ ইনসিওরের টাকা—সব ঢেলে এই বাড়িখানি গড়ে তুলেছিলেন মৃগাঙ্ক। মনের মতো সুন্দর। তবে সৌন্দর্য বিধানের পরিকল্পনা ক্ষেত্রে ছেলে করঙ্ক আর ছেলের বৌ সুরভিকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তবে সর্বাণীকেও একেবারে হুট আউট করেননি। দেয়ালে তাকবহুল রান্নাঘর, দেয়াল আলমারি সহ ভাঁড়ার ঘর, এবং ছাদের সিঁড়ির মাথার ঠাকুরঘরটি

সর্বাণীর প্ল্যান অনুযায়ীই হয়েছে।

তা বলে সর্বাণী যে সংসার কেন্দ্র থেকে স্খলিত হয়ে ঠাকুর ঘরেই আশ্রয় নিয়েছেন, এমন মনে করার হেতু নেই। কেন্দ্রভূমিতেই আছেন তিনি ভালোমত শক্ত শিকড়েই। এবং আছেন হয়তো প্রখর বুদ্ধি এবং নিপুণ আচরণের গুণে। ছেলের বৌয়ের সঙ্গে তাঁর দিব্যি সুসম্পর্ক। কুটনো কুটতে বসে সর্বাগ্রে শুধোন, বৌমা, কী রান্নাবান্না হবে বল!

বৌমাও নির্বোধ নয়। তিনি হেসে গা পাতলা করে বলেন, ওসব হিজিবিজি নিয়ে মাথা ঘামাতে আমার বয়ে গেছে। আপনি ঘামান। তবে—বাঁধাকপিটা দিয়ে ভেটকি মাছটা রাঁধলে মন্দ হয় না।··· পার্শেগুলোও তো দেখলাম খুব ছোটছোট, শুধু ভাজা করলেও হয়।··· ও বাবা—আপনার স্টকে তো অনেক তরকারি দেখছি, সুক্তো রান্না হোক না, বাবা। ফেভারিট।

কুটনোর দায়িত্ব শাশুড়ির, রান্নার দায়ত্ব দুজনারই। সুরভির ছেলেমেয়ের পড়াশুনো, স্কুলে পাঠানো, বরের অফিসযাত্রার প্রাক্কালে ব্যাগ গোছানো ইত্যাদি বেশ কিছু কাজ তো আছেই তাছাড়া— শ্বশুরের তো সর্বদাই হা বৌমা! যো বৌমা! বৌমা চোখের আড়াল হলেই তিনি তাঁর কোনও কিছুই খুঁজে পান না। না জামা-কাপড়, না ওষুধ-বিষুদ না চিঠি-পত্তর কাগজ-পত্তর!

হয়তো, এও ইচ্ছাকৃত একটু লীলা। এই নাবালক জনোচিত অসহায়ের ভূমিকা। কাজেই শ্বশুর-বৌয়ের সম্পর্কটিও বেশ সুসম্পর্ক! ···খবরের কাগজে বিশেষ কোনও একটি খবর পড়লে, হাঁক দিয়ে ওঠেন, বৌমা! আজকের কাগজটা দেখেছ? ·· আবার হয়ত হেসে উঠে বলেন, তোমার তো দেখা, হাতে নিয়েই হয়তো 'ক্রসওয়ার্ড পাজল নিয়ে বসে পড়েছ!

আবার এও বলে ওঠেন, বিড়লা অ্যাকাডেমিতে যে ফটোগ্রাফি একজিবিশন চলছে, একদিন দেখতে গেলে হয় বৌমা, পড়ে বেশ আগ্রহ আসছে।

অপরপক্ষে বৌমাও কখন বলে ওঠেন, বাবা দেখেছেন কাণ্ড! আপনার মোহনবাগানের কী মাথা হেঁট।

তখন হয়তো শ্বশুর বৌতে আজকের দিনের খেলার রাজনীতি নিয়ে দস্তুরমত আলোচনা চলে।

শ্বশুর আগেকার দিনের খেলোয়াড়দের সততা, আবেগ, আদর্শ বিষয়ক তত্ত্ব আওড়ে দুঃখপ্রকাশ করেন, এযুগে সব্বাই টাকার কাছে মাথা মুড়িয়ে বসে আছে বৌমা!

তেমন তেমন সময়ে বৌমার শাশুড়ি এসে পড়ে বলে ওঠেন, হয়েছে শুরু? মনসার মন্দিরে ধুনোর গন্ধ দিয়ে বসেছ তো বৌমা? থামাও তো! দেখ দিকিন কাগজটা—শুনছি নাকি কোথায় তাঁদের শাড়ির খুব বেশি বেশি 'ছাড়' দিচ্ছে যেন।

এ প্রসঙ্গটি অবশ্য বৌমার কাছে খেলার জগতের 'সেকাল ও একাল' নিয়ে আলোচনার থেকে অনেক প্রীতিকর প্রসঙ্গ, কাজেই শাশুড়িকেও ফ্যালনা করে বসে না। এবং হাসি গোপন করে, ইশারায় জানায়, এ প্রসঙ্গটি বাবার অসাক্ষাতে হলেই সহজ আর অবাধ হতে পারবে, অতএব পরে হবে!

সুরভি খুব হালের মেয়ে নয় তার ছেলেটা সতেরোয় পড়েছে, মেয়েটা পনেরোয়। কাজেই নেহাত এযুগীয় অসহিষ্ণুতায় স্বর্ণহংসীর পেট চিরে সোনার ডিমগুলো একসঙ্গে পেয়ে যাবার তালে তার পেট চিরতে বসে না। সে শ্যাম এবং কুল দুই'ই রাখে। অবশ্য সবটাই যে অভিনয় অথবা পলিটিকস্, এমন অন্যায় কথা বলা চলে না। তার মধ্যেকার সহজাত একটি মমতাপ্রবণতা, আর শান্তিপ্রিয়তা, এরাই বেশি কাজ করে।

সুরভির প্রকৃতিই হচ্ছে, সংসারে সবাই যাতে বেশ সন্তোষে থাকে, তার পালে বাতাস লাগানো। সবাই সন্তোষে থাকলেই যে বাড়িতে একটি শান্তির পরিবেশ থাকে, এটি তো ঠিক। তাই সুরভি যদি কোনও সময় সর্বাণীর মুখখানি ভারি দেখে, তা ভারি তো কখনও কখনও থাকতেই পারে, তাঁরও তো বেশ তাজাই একটি দাম্পত্য

জীবন আছে। নেহাত বুড়ো হাবড়া তো নয়। কাজেই সে জীবনে মান অভিমান মতান্তর মনান্তর সবই আছে। এই যে বৌ! তাঁর পিতৃকুলের সঙ্গে সর্বদাই দহরম মহরম, আসা যাওয়া খাওয়া মাখা, কিন্তু সর্বাণীরও যে একটা পিতৃকুল আছে, বাপ মা ভাই না থাকুক, বোন ভগ্নিপতিরা তো রয়েছে, কই তাদের নিয়ে কবে কী হচ্ছে?

না, বৌকে তিনি হিংসে করতে বসেন না, আর নিজেও যে বোন ভগ্নিপতির জন্যে আকুল তাও নয়, তবে হঠাৎ যদি কানে আসে 'বৌমা, তোমার ভাইদের তো অনেকদিন দেখি না। ডাক না একদিন একটা ছুটির বার দেখে—' তা'হলে হঠাৎ একটা অভিমান উথলে উঠবে না? ···আর যদি কোনও এক সময় সেই বিবেচক ব্যক্তিটির কাছে বলে ফেলেন, 'আমারও যে মা বাপের কুলে কেউ আছে, এ কথাটা কারুর মনে থাকে না!' ···আর তার উত্তরে তৎক্ষণাৎ শুনতে হয়, তোমারই বা কে উদ্দেশ করে? বোনেরা তো 'দিদি' বলে সাতজন্মে একটা চিঠিও দেয় না। - ' তাহলে মুখ ভারি হয়ে উঠবে না?

কপালক্রমে বোন দুটিও তেমনি। বিজয়াদশমীতে কদাচই আসে। কলকাতা থেকে কলকাতা, তাও পোস্টকার্ডেই প্রণাম সারে। ভগ্নিপতিরাই বা কী? পুরুষ মানুষ আফিস ফেরত টেরতও তো কোনওদিন একবার ঘুরে যেতে পারে? তো দু'জনেই সমান! আসলে হয়তো তাদের ধারণা কর্তব্যটি বড়র দিক থেকেই হওয়া উচিত। সেটা হয় না বলেই তাদের মধ্যেও গা-ঝাড়া ভাব।

এমনিতে ওদের নিয়ে যে বিশেষ আলোড়িত হন সর্বাণী তা নয়, তবে বৌয়ের বাপের বাড়ির দিকের রমরমায় মৃগাঙ্ক যে আগ্রহীর ভূমিকা নেন, সেটাই যেন মনকে একটু 'ক্ষুদ্রতায়' নিয়ে গিয়ে বসে। ···যে ক্ষুদ্রতার সঙ্গে থাকে একটু শূন্যতাবোধ।

অথচ সুরভির ভাইয়েরা যখন 'মাসিমা মেসোমশাই' বলে একান্ত আপনজনের মতো ব্যবহার করে, তখন তো মনটা স্নেহে আর খুশিতে ভরেই ওঠে। সুরভি যদি ওদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বলে, এত বেশির কী দরকার মা? মাছ মাংস এত শত তারমধ্যে আবার পায়েস!'

সর্বাণী বলেন, 'তা হোক তোমার ভাইয়েরা পায়েস ভালবাসে।'

'মন' জিনিসটা অনেকটা যেন পলকা কাচের মতো, কখন যে কোন দিকটায় আলো পড়ে ঝিকমিকিয়ে ওঠে বোঝা দায়।

কাজেই মাঝে মাঝে বিষণ্ণতাও আসে। মুখে মেঘও নামে বৈকি।

তো তেমনটি দেখলেই সুরভি না দেখার ভান করে কাছে এসে বসে পড়ে অবলীলায় বলে ওঠে, 'দেখেছেন মা আপনার আদুরে গোপাল নাতির কাণ্ড!' · অতঃপর 'কাণ্ডর' যা ফিরিস্তি দেয়, তাতে সর্বাণীর ঘন মেঘে ঝোড়ো হাওয়া এসে লাগে। ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন, 'ওমা! সে কী? সবদিন টিফিন খায় না ফেরত নিয়ে আসে? ইস্কুলে কিছু আলাইবালাই খায় বুঝি?' ...অথবা হয়তো 'মা আপনার ডানা ওঠা নাতনির কথা শুনেছেন? এই তো 'জন্মদিন' আসছে সামনে? এখন থেকে বলে রাখা হয়েছে 'জন্মদিনে' ঘটায় কাজ নেই। ওর বন্ধুটন্ধুদের নেমন্তন্ন করতে হবে না।'

তাতেও কাজ হয়, সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠেন সর্বাণী, 'কেন? বন্ধুদের অপরাধ?'

বন্ধুদের অপরাধ নয়, আপনার নাতনিরই পাকামি! 'বুড়ো ধাড়ি হয়েছেন তিনি, এখনও বাচ্চার মতন জন্মদিনের ঘটা শুনে না কি বন্ধুরা হাসি-ঠাট্টা করে।

সর্বাণী সতেজে বলে ওঠেন, 'তা হাসবে বৈ কি! নিজেদের হয় না বোধহয়। ঠিক আছে, ওর বন্ধুদের না করি আমাদের বন্ধুবান্ধবদের করা হবে। এখনকার ছেলেমেয়েদের ওই 'বন্ধু'গুলোই যত নষ্টের গোড়া। দুর্মতি দিতে ওস্তাদ।' ...ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাতাস অন্য খাতে বয়।

আবার যদি সুরভির চোখে পড়ে বাসন মাজুনি মেয়েটা সর্বাণীর কাছে বকুনি খেয়ে মরছে, আড়ালে আবডালে তাকে অনেক খেটেছ চা খেও, মিষ্টি খেও, বলে টাকা পয়সা গুঁজে দেয়। সকলের সন্তোষ বিধানটিতেই সুরভির সন্তোষ।

সুরভির পদ্ধতিটি সত্যিই কাজের, কিন্তু কে কত ওই পদ্ধতির

ধার ধারতে যাচ্ছে ?

তবে সুরভিরও কি আর ভিতরে চাপা অভিমান নেই ? এই যে তার এত শখ ছিল গানের দিকে উন্নতি করে এগিয়ে যাবে। 'আকাশবাণী'তে টিভি'তে গান গাইবার চান্স পাবে। তা সে চেষ্টা আর করল কে কবে ? অবিশ্যি 'কে' অর্থে করঙ্কই। তাকে কতবারই বলেছে সুরভি, 'গলাটলা যার যতই ভাল হোক মশাই 'ধরাধরি' ছাড়া এযুগে কোথাও চান্স পাওয়া যায় না—' করঙ্ক অসহায় ভাবে বলেছে, 'আমি কাকে ধরাধরি করতে যাব বাবা ? তোমাদের গানের জগতে কাকে চিনি ? তোমার মাস্টারমশাই টশাইরা যদি—'

তখন সুরভি রেগে উঠেছে, 'মাস্টারমশাই ! তাদের সঙ্গে কোনকালে সম্পর্ক চুকিয়ে বসে থাকা হয়েছে, যোগাযোগ রাখতে পেরেছি ?'

তা পারেনি যে পতিগৃহের নির্দয়তায় বা কঠোর কোনও অনুশাসন তা অবশ্যই নয়। 'সুরবিতান'-এর ছাত্রী ছিল সুরভি, বিয়ের আগেই ডিপ্লোমা পাওয়া হয়ে গিয়েছিল, তো সেখানের 'দাদা' 'দিদি' জন না কি বিয়ে হয়ে যাচ্ছে শুনে বলেছিলেন, 'বিয়ে হয়ে যাচ্ছে বলেই যেন গানটান ছেড়ে বোস না। তোমার এমন গানের গলা, চর্চা রাখতে পারলে—'ইত্যাদি !

কিন্তু বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তো 'আকাশ' বাবুর আবির্ভাব। ···তাকে সামলে তুলতে না তুলতে 'আলো'। তারপর আর কী ? যা হয়। গড়িয়ে গেল। ·· সুরভির ভাগ্যে আবার ছেলেমেয়ে দু'জনেই নেহাত নিরেট, গানটানের দিক দিয়ে যায় না। আলোকে গানের স্কুলে ভর্তি করবার জন্যে অনেক ইচ্ছে প্রকাশ করেছে সুরভি কিন্তু মেয়ে রাজি হয়নি। বলেছে, 'ও আমাকে দিয়ে হবে টবে না বাবা। গলায় সুরের বালাই নেই। তারচেয়ে—'

তার চেয়ে ? আর কিছুই নয় মেয়ে সাঁতার শেখার ক্লাবে নাম লেখালেন। ছোট থেকেই কেমন স্বাধীন ওরা। নিজের ইচ্ছেটাকে দিব্যি প্রতিষ্ঠা করে নেয় !

সুরভি করঙ্ককে শুনিয়ে বলেছে, 'গলায় আর সুর আসবে কোথা

থেকে? যেমন লোকের কন্যে।'

কঙ্ক রাগের দিক দিয়ে যায়নি। বলেছে 'তা সত্যি। যা বলেছ। 'অ-স্থরের' কন্যে তো! স্থর তার ধারেকাছে আসে না।

এখন অবশ্য আর সে খেদ পোষা নেই স্থরভির। তবে ছেলেমেয়ে একটু বড় হবার পর স্থরভি পাড়ার একটা নতুন গজানো গানের স্কুলে ছোট ছোট মেয়েদের গান শেখাবার চাকরি নিয়েছে। সপ্তাহে দু'দিন ক্লাশ নিতে হয়। ·· তা ক্রমশ দাঁড়িয়েও গেছে স্কুলটা। এযুগে যে যা ফেঁদে বসে, দাঁড়িয়েও যায় দেখা যায়। হঠাৎ হঠাৎ যেখানে সেখানে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে 'নার্সারি স্কুল' প্রথমটা হয়তো তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে, কিছুদিন যেতেই তার কী বোলবোলাও দরজায় ছেলেমেয়ে নিয়ে ধর্না দিচ্ছে মা বাপ। 'সিট' দিতে পারছে না স্কুল!

সর্বাণী অবশ্য প্রথমটা বলেছিলেন, 'শনিবারের বিকেল আর রবিবারের সকাল? ছুটির তো মোক্ষম দিন। এ চাকরি নিতে চাইছ বৌমা? কঙ্ক রাজি হচ্ছে?' ···আসলে নিজের অনিচ্ছেটুকুর একজন সমর্থক চাইছিলেন। ···কিন্তু সে গুড়ে বালি হল।

কঙ্কর অবশ্যই ভিতরে সমর্থন ছিল, কারণ গান ছেড়ে দিতে বাধ্য হওয়া স্থরভির চাপা অভিমানটুকুর খবর তো তার অজানা ছিল না। তবে মুখে, মায়ের সামনে অসহায়ের পেটেন্ট ভঙ্গিতে দু-হাতের চেটো উল্টে বলে উঠেছিল 'আমার রাজি হওয়া? কে তার ধার ধারছে মা?'

সর্বাণী বলেছেন, 'কেন বাপু ও ভাবে কথা বলছিস? বৌমা কি তোকে ডিঙিয়ে কিছু করে?'

কঙ্ক মুচকি হেসে বলেছে, দরকার হয় না। বুদ্ধি করে আগেই বড় গাছে নৌকো বেঁধে বসে থাকে!

সেই 'বড়গাছটি' অবশ্যই মৃগাঙ্কমোহন। বরাবরই যিনি মোহনবাগানের মতো, বৌমারও সাংঘাতিক সাপোর্টার। তিনিই বৌমার সঙ্গে গিয়ে খবরপাতি সংগ্রহ করে তাকে চাকরিতে ভর্তি করে দিয়ে এসেছিলেন।

নেহাতই পাড়ার ব্যাপার, তাই এমন অবাধ সমর্থন!

সর্বাণীকে বলেছেন 'হপ্তায় দু'দিন, তাও মাত্র দু'ঘন্টার ব্যাপার এতে তোমার সংসার ভেসে যাবে না।'

'আমার সংসার ভেসে যাওয়ার কথা বলেছি আমি?'...রেগে উঠেছেন সর্বাণী। 'বলছিলাম কঙ্কর সুবিধে অসুবিধের কথা। ছুটির দিনটাই—'

মৃগাঙ্ক দরাজ গলায় বলেছেন, এতে আবার সে ব্যাটার কী অসুবিধে? অ্যাঁ? তুমি থাকতে? ছুটির দিন তো না? ব্রেকফাস্টে কিছু স্পেশাল আইটেম—দুটো ভালমন্দ খাঁটি, এই তো? ...আর কী? সেটা তোমার থেকে বৌমা বেশি পারবে?'

ব্যস! এক ঢিলে দুই পাখি মেরে বৌমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন মৃগাঙ্ক মৌলিক!

তা এটা ক্রমেই অভ্যাস হয়ে গেছে। যে কোনও অসুবিধেজনক ব্যাপারকেই চালাতে চালাতে ঠিকই সেটা সংসারের চাকার খাঁজে খাঁজে বসে যায়। রবিবার সকালে 'সুরঝঙ্কার' এ যাবার আগে সুরভি ছুটির দিনের ব্রেকফাস্টের স্পেশাল ডিশ-এর ব্যবস্থা অর্ধেকটাই এগিয়ে রেখে যায়, বাকিটা সর্বাণী সমাধান করেন। এবং বেশ হৃষ্টচিত্তেই করেন। এমনিতে বলেন বটে, 'বৌমা সামনে না থাকলে, সব কিছুতেই চোখে অন্ধকার দেখি'...তবে আসলে সামান্যক্ষণের সাময়িক অনুপস্থিতিটিতে কিন্তু বেশ আলোই দেখেন। মনে বেশ যেন একটু 'ফ্রি' ভাব আসে।

সুরভি কি সর্বাণীর ওপর সর্দারি করতে আসে? মোটেই তা নয়। তবে সুরভির অনুপস্থিতিতে কঙ্ক যে লক্ষ্মীয় ফ্রি-ভাবে রান্নাঘরে এসে গল্প জোড়ে, মাকে বলে 'যথারীতি তোমার ঘাড়ে সবটি চাপিয়ে কেটে পড়েছেন তো চালাক মহিলাটি?' এতে ভারি প্রীত হন সর্বাণী!

* * *

আরও একটি চাপা অভিমান ভিতরে ভিতরে ছিল সুরভির। তো সেটি আলো আর আকাশ ছোট থাকতে। ছোটবেলায় দুটোই ছিল

একান্তই দাদু-দিদার অনুরক্ত ভক্ত। দাদু-দিদার কট্টর সমর্থক।··· আলোর তো কাজই ছিল ওনাদের কাছে মায়ের নামে অভিযোগ করা। অতএব চাপা দুঃখ, 'ছেলেমেয়ে পর' হয়ে যাচ্ছে।

তো সে তো ওরা নেহাত ছোট থাকতে! একটু বড় হয়ে ওঠা মাত্রই ওরা আর অপর কারুর সমর্থক নয়, কেবলমাত্র 'আত্ম সমর্থক'। ···এখন ওরা দাদু দিদা মা বাবা চারজনকেই সমদৃষ্টিতে দেখে। অর্থাৎ চারজনকেই 'সেকেলে' ভাবে, 'গাঁইয়া' ভাবে, 'অনগ্রসর' ভাবে। ···আর ওদের 'বন্ধু'দের সম্পর্কে এতটুকু এদিক ওদিক কথা শুনতে পেলে, চারজনকেই একই পদ্ধতিতে 'থুড়ে' ছাড়ে। তাদের নাম-মাহাত্ম্য উপভোগ করে তারা। এখনিই 'আলো' আর 'আকাশ'-এর মতোই মুক্তজীব তারা।

আর ছ'জনের মধ্যে বাকি জনটি?

করঙ্ক মৌলিক? একটি নামকরা ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। তার মধ্যেই কোন বিপরীত হাওয়া নেই। কেনই বা থাকবে? সংসারে তার পজিশন যে গৃহবিগ্রহ তুল্য। মা বাবার কাছে তো বটেই, বৌয়ের কাছেও প্রায় তেমনি যত্ন সেবাই পায়, হয়ত সংসারের রীতিনীতিতেই। সকাল থেকে সংসার চক্রঘানিতে চালিত হয়, ওই বিগ্রহটির সুবিধে স্বস্তি আরাম আমোদ নিধান কল্পে। আর তেতাল্লিশ বছর বয়েসেও সংসারে বিগ্রহটির ভূমিকা বালগোপালের। কোন দায়-দায়িত্বের ভার কেউ তার ওপর চাপাতে আসে না।

মৃগাঙ্ক এখনও যথেষ্ট কর্মঠ, এবং ছেলে অন্তপ্রাণ। অতএব করঙ্ককে কোনদিন জানতে হয় না বাজারটা কোনমুখো, আর বাজার দরটাই বা-কোন উচ্চলোকে জানতে হয় না, ইলেকট্রিক বিল টেলিফোন বিল কোথায় গিয়ে জমা দিতে হয়, জানতে হয় না বাড়ির ট্যাক্স কত, এবং কবে কবে? দুধের কার্ড রেশন কার্ড কী রকম দেখতে হয়, তাও বোধহয় ভাল জানে না করঙ্ক।

এই অবস্থা। তাছাড়া কোন চল্লিশোর্ধ বিবাহিত পুরুষ যদি অফিস থেকে ফেরার সময় দেখতে পায় তার আসার পথ চেয়ে পাশাপাশি

দাঁড়িয়ে তার বৌ এবং বাবা, যদি দেখতে পায় দূরদর্শনের পর্দার সামনে সোফায় পাশাপাশি বসে তার বৌ আর মা, এবং যদি দেখে—মা এবং বৌ একসঙ্গে সেজেগুজে হাস্যবদনে মার্কেটিঙে যাচ্ছে, সিনেমায় যাচ্ছে, পুজো প্যাণ্ডেলে যাচ্ছে, এখানে ওখানে ফাংশানে যাচ্ছে, তার থেকে সুখি সৌভাগ্যবান আর কে আছে ?

অতএব এই ছয় সদস্যের সংসারটি একটি পরিচ্ছন্ন আর ছন্দবদ্ধ ভাবেই দৈনন্দিন আবর্তনের তালে চলতে থাকে। মাঝেমধ্যে স্কুলে পড়ুয়া দুটো টিন এজার ছেলেমেয়ের বাচনিক ঔদ্ধত্য, বা 'কাজের মেয়ের জ্বালাতুনে আচরণ' এবং যখন তখন অনুপস্থিতি, রান্নার গ্যাস ফুরনো, সম্যক পরিমাণে কেরোসিন না পাওয়া ইত্যাদির মতো বিরক্তকর ব্যাপার সেই ছন্দে চিড় খাওয়াতে পারে না। অতএব বলতে পারা যায় মৃগাঙ্ক আর সর্বাণীর হাতে গড়া এই সংসারটি বেশ তরতরিয়ে চলে।

কাজেই আজ একই ঘটনা নিয়ে ছজনে ছ'রকম অভিমত প্রকাশ করলেও একই জায়গায় বসে বসে। কেউ আপন কেন্দ্রে উঠে যায় না। বরং যেন এখন একটু বেশি কাছাকাছি হয়েই বসে।

সর্বদা একটা আতঙ্ক আতঙ্ক ভাব নিয়ে যে বসবাস ছিল, সেটা তো বলতে গেলে বায়বীয়ই। সবাই 'দিনকাল' নিয়ে আতঙ্কিত অতএব আমাদেরও আতঙ্কিত থাকা উচিত—এই ধরনেরই একটা মনোভাব।...'

কিন্তু আজ কিছুক্ষণ আগে যে একটি ব্যাপার ঘটে গেল, তাতে আতঙ্কটা তো আর বায়বীয় থাকল না। এ তো একেবারে জমাট হয়ে বুকে জেঁকে বসল।

* * *

দোতলায় উঠে এসে কিছুক্ষণ গেছে স্তব্ধতায়। কারণ সকলেই বেশ কয়েকবার ওপর-নীচ করার অর্থাৎ সিঁড়ি ভাঙার শ্রমে ক্লান্ত। তাছাড়া লোডশেডিং। কে কোন কাজটা করতে যাবে ?

হঠাৎ আলো এসে গেল।

কে যেন বলে উঠল, 'বাবাঃ! বাঁচা গেল।'

মৃগাঙ্ক আস্তে বললেন, 'বাঁচা গেল কিনা এখনই তা' বলা চলে না।'

এটা অবশ্য অন্য অর্থে, তবে তাঁর মানসিক অবস্থা পরিস্ফুট হল এতে!

সুরভি বলল, 'ব্যাপারটি ঠিক বোঝা গেল না। প্রথমটায় তো ওকে ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াতে দেখেই মনে হয়েছিল, ব্যস! এটাই আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত। দিল বলে বুকে একটা ছোরা বসিয়ে—'

'চেহারাটি তো স্রেফ সেই রকমই'—করঙ্ক বলে ওঠে, 'আমিও তো তোমাদের দরজা খুলতে অত দেরির পর ঢুকেই ওই মূর্তিটি দেখে ভাবলাম, নয়তো বা ভয়ানক কিছু একটা ঘটেই গেছে।'

সর্বাণী বললেন, 'আমার তো বাবা হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছিল।'

আকাশ হঠাৎ বলে উঠল, 'সকলেই এত 'কাওয়ার্ড' একদিকে একটা মাত্র লোক, অথচ একদিকে ছ' ছ'জন লোক, তবুও—'

আলো যথারীতি দাদার প্রতিবাদ করে উঠল কারণ, এটাই তার পেশা, 'থাম দাদা। খুব হয়েছে। এখন ভারি বীরপুরুষ সাজতে আসা হচ্ছে। তখন তো কই তাকে কিছু—'

'বাঃ! তখন আবার তাকে কী করতে যাব? সে কি আমাদের অ্যাটাক করেছিল? বরং তো হাতে-পায়েই ধরছিল।'

মৃগাঙ্ক গম্ভীরভাবে বলেন, 'শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাই করল, কিন্তু প্রথমটায় কি ঠিক বোঝা যায়? দুষ্কৃতকারীদের প্রথমটা ওই ভালো-মানুষি ভাবটা তো একটা আর্ট! নিরীহ ভাবে · দাদা আপনার ঘড়িতে কটা বেজেছে! ··বলে, দাঁড় করিযে ফেলে ঘড়িটি ছিনতাই করে বসা – কিম্বা দাদু এই নম্বর বাসটা কোন রাস্তা দিয়ে যাবে? বলে ন্যাকা সেজে, তারপর বলে ওঠা, 'পকেটে কী আছে বার করুন' এই রকমই তো করে ওরা। কাজেই—বাবু গো আমায় মারতে আসছে – বলে ঢুকে পড়ে নিজেই মারতে বসবে, এটা কিছু অভাবিত নয়!'

আলো বলে ওঠে, 'কিন্তু দাদু, আমার গোড়া থেকেই মনে হচ্ছিল,

সত্যিই ওকে কেউ তাড়া করেছিল। নইলে অত হাঁপায়?'

স্নরভি এর মধ্যেই একটু হাসে, 'ও রকম অভিনয় ওসব লোকেদের খুব জানা থাকে।

সর্বাণী বললেন, কিন্তু হঠাৎ অমন না বলে নিঃশব্দে চলে গেল কেন? শেষমেষ জিনিসটা রইল বাবু— দেখবেন, বলে তবে যাবে তো?'

আলো এখন হি হি করে হেসে ওঠে, 'ভারি তো জিনিস।'

সর্বাণী বলে ওঠেন, 'তোদের কাছে 'ভারি' তো ওর কাছে হয়তো সর্বস্ব। কথায় বলে, 'গরিবের রাং-ই সোনা।'

বাবাঃ! 'দিদা এত ছড়াও জানে। সব কথায় ছড়া।'

'ওমা! শোনো কথা! এরমধ্যে আবার ছড়া দেখলি কোথায়?'

আহা, 'এটা ছড়া না হয় শুধুই 'প্রবাদ' না কী যেন। তো কথায় কথায় ছড়া বল না?'

'কী জানি বাবা কখন আবার এত ছড়ার ছড়াছড়ি করি? দিদাকে হ্যাজ করাই তোদের সবচেয়ে আমোদের কাজ। তাই সবসময় 'সব শেয়ালকে ছেড়ে দিয়ে, ওই বেঁড়ে শেয়ালকেই ধর। যত দোষ নন্দ ঘোষ এই দিদা!'

হঠাৎ দুই ভাইবোন এতোক্ষণের ভারি হাওয়াটাকে উড়িয়ে দিয়ে হি হি করে হেসে ওঠে, ও 'দিদা, এটা তা'হলে কী? ছড়ার গড়াগড়ি?'

'উঃ! এত ফাজিলও হয়েছিস তোরা'—বলে এখন কঙ্কর স্নানের ঘরের দিকে এগোয়, এবং বোধহয় মাকে প্লিজ করতেই বলে ওঠে, 'উঃ! হঠাৎ এক রহস্য রোমাঞ্চকব নাটক ঘটে গিয়ে সবকিছু মাথায় উঠে গেল। পেটের মধ্যে মিনিংবাসের হর্ন বাজছে মা! কী আছে বার কর।'

তখনকার মতো, সবাই যে যার কাজে ছড়িয়ে যায়। কারোর কাজ গ্যাস স্টোভ খোলা, কারো কাজ টিভি খোলা, কী যেন একটা ভালো সিরিয়াল ছিল টিভি'তে, সেটা মাঠে মারা গেল আজ।

দেখেছেন, তবু মৃগাঙ্ক আর একবার শুধোলেন, 'দরজাটা ভালভাবে লক করা হয়েছিল তো কঙ্ক?'

কঙ্কর হয়ে কঙ্কর বৌ উত্তর দিল, 'হ্যাঁ বাবা, খিল ছিটকিনি দুটোই দেওয়া হয়েছে।'

'তালাচাবিটা ?'

'না সেটা এখনও হয়নি। ওপরতলা থেকে নিয়ে যাওয়া হয়নি তো!'

হ্যাঁ, অধিকন্তু ন দোষায় হিসেবে রাতে সদরে একটা তাল'চাবিও লাগানো হয় ভেতর থেকে। সকালে বাসনমাজুনি ঘরমুছুনি বিজলী-বালা বেল বাজালে নিয়ে গিয়ে খুলে দেওয়া হয়। তালার চাবিটা নীচের তলাতেই কোথাও না রেখে দুটোকেই যে বয়ে ওপরে নিয়ে আসা হয় তার কারণ শ্রীমতী বিজলীবালার হাতটান রোগটি বাবদ। নীচে সিঁড়ির ওপর কোথায় নামানো থাকলেই সেটি 'হাওয়া' হয়ে যায়।...

আর হাওয়া হয়ে যাওয়া জিনিসের পাত্তা কে দেবে ? কার কাছে তার পাত্তা পাওয়া যাবে ? সে সিঁড়িতে ঝাঁটা-ন্যাতা বুলিয়েছে বলেই কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছে ?

* * *

রাত্রে খাবার টেবিলে কথাটা উঠল।

না উঠিয়ে তো পারা যাচ্ছে না, আতঙ্কটা যে এখনও সিঁড়ির তলায় দেয়াল ধারে জমাট বেঁধে পড়ে রয়েছে।

'আচ্ছা, সত্যি লোকটার মোটিভ কী ছিল বলে তোমার মনে হয় বৌমা ?'

'বৌমার বদলে তাঁর শাশুড়ি উত্তরটা দিয়ে বসেন, মোটিভ আবার কী ? কারণটা তো বললই খুলে।'

'সেটা যে বানানো গপ্পো নয়, তাই বা কে জানে ?'

'বানানো ছাড়া আবার কী ?...আলো নামক স্কার্ট-ব্লাউজ পরা মেয়েটি একশ পার্সেন্ট আত্মস্থ গলায় বলে ওঠে, 'স্রেফ বানানো। ফুটপাথের জায়গা দখল নিয়ে আবার মারদাঙ্গা কিসের ? ফুটপাথ কারো কেনা ?'

এখন আলোর বাবা একটু দার্শনিক হাসি হাসে, 'এ পৃথিবীতে কারুরই কিছু কেনা নয়রে বাবা! এক সেকেণ্ডে সব দখলদারি ছেড়ে চলে যেতে হয়। দখলে থাকবার মধ্যে বড়জোর সাড়ে তিন হাত জমি। তাও আর কতক্ষণের জন্যে?'

—তা ঠিক!

আলোর মা বলে 'কী বলেন বাবা? সত্যি, ভেবে দেখলে বেঁচে থাকলেও মানুষ কতটুকু জমি দখল করতে পারে? দাঁড়িয়ে থাকলে দু বিঘৎ, শুয়ে পড়লে সাড়ে তিন হাত।'

আলোর ঠাকুমা গুছিয়ে পরিবেশন করতে করতে কপালটা কুঁচকে বলেন, 'দু' বিঘৎ মানে?'

'বাঃ! এক একখানা পায়ের জন্যে এক বিঘত! অবশ্য যদি—হি-হি—খোঁড়া না হয়।'

সর্বাণী অবাক গলায় বলেন, 'সবাইয়ের এক বিঘত? কতো লোকের ধাংড়া ধাংড়া পা।'

সুরভি হাসে তাদের হাতও ধাংড়া। যার যার পা হচ্ছে নিজের হাতের এক বিঘত।

'ওমা! তাই বুঝি? এতোখানি বয়েস পর্যন্ত তা তো জানি না বাবা! এই জন্যেই বলে, শেখার কোনও বয়েস নেই! মরণকাল পর্যন্ত শেখবার থাকে। তা' ওইটুকুই তো মাত্র তাও মানুষের রাতদিন দখলদারি নিয়ে মারামারি কাটাকাটি।

সুরভি বলে 'যা মোটেই নিজের নয়, তার দখলদারি নিয়েও। নয় বাবা? রেলগাড়িতে উঠেই লোকে একখানা রুমাল বিছিয়ে কী একখানা খবরের কাগজ রেখে মার্কা মেরে রাখে, 'এ সিটটি আমার।' ফুটপাথের কথা বলছিস আলো? কার লেখা যেন একটা ভ্রমণ কাহিনীতে পড়েছিলাম কোন একটি তীর্থস্থানে একটা গাছতলার দখল নিয়ে দু'জন ভস্মমাখা কৌপিনধারী সাধু মারপিট করে রক্তগঙ্গা করে হাফ খতম। একজন অপরের মাথায় নিজের হাতের ভারি কমণ্ডলুটি ধাঁই করে বসিয়ে মাথাটি ফাটিয়ে দিয়েছেন, অপরজন তাঁর হাতের ত্রিশূলটি নিয়ে

অপরজনের পেটটা প্রায় ফুটো করে ছেড়েছেন। এই হচ্ছে মানুষ।'

অতএব ওই লোকটার কাহিনীটিকে 'গপ্পো' বলে উড়িয়ে দেওয়াও চলে না।

'লোকটা কি তাহলে গুণ্ডাই?'

'না কি খুনে দাঙ্গাবাজ?'

'চোর ছ্যাঁচোড়ও তো হতে পারে। হয়তো ওইভাবে বাড়ির সন্ধান-সুলুক জেনে নিয়ে গেল। বাড়িতে কে আছে না আছে, কী রকম অবস্থা—'

'আমার তো বাবা শেষপর্যন্ত ভিখিরিই মনে হচ্ছিল।'

'তাছাড়া যখন বলা হল, চাটা খেতে কিছু নাও, নিতে চাইল না কেন?'

'আমি বলছি স্রেফ পাগল।'

বোলে, 'আমার কথাই শেষকথা' এইভাবে সেই আত্মস্থভঙ্গিতে মাংসের হাড় চোষায় মন দেয় আকাশ!

* * *

কিন্তু 'শেষকথা'র পরেও অশেষ কথা থাকে! না হয় পাগলই হল, ওর ওই জিনিসটা?

সকালে তোমার বিজলীবালার চোখে পড়লে স্রেফ হাওয়া হয়ে যাবে।

হ্যাঃ! কী একেবারে লোভনীয় দামী জিনিস। একখানা ছেঁড়া গামছার পুঁটুলি।

তাতে কী? ওই 'হাতটান' জিনিসটা কি অভাবে করে? করে স্বভাবে। ওটা একটা মানসিক ব্যাধি।

নাঃ! ওটা সরিয়ে রাখা দরকার। ধর লোকটা সকালে জিনিসটা নিতে এল, আর দেখল সেটি উপে গেছে। তাহলে? কী বলবে তাকে?

তা বটে! তবে বাবা সরিয়ে রাখা হোক কোথাও।

সর্বাণী আঁতকে ওঠেন, 'এ মা! এখন আবার ওই নোংরা বিচ্ছিরি ছুঁতে যাবে কে?'

'আঃ দিদা! সেই তোমার ছোঁয়াছুঁয়ি। রেখে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেললেই তো হল। আমি যাচ্ছি কোথাও রেখে দিতে।'

'এমন জায়গায় রাখবি যাতে বিজলীর চোখে না পড়ে। নিক আর না নিক সাত সতেরো জিজ্ঞেস করতে তো বসবে। আর পাড়ায় চাউর করে বেড়াবে। ...কে জানে বাবা কী ঘটনা। জেল ভেঙে পালিয়ে আসা কয়েদি কিনা তাই বা বিশ্বাস কী?'

'দ্যাটস রাইট। মা ঠিক বলেছ! তাও হতে পারে। ওদের সঙ্গে ওইরকম একটু নিজস্ব জিনিসের পুঁটুলি থাকে। ...হয়ত 'ধরতে আসছে মারতে আসছে' পুলিশই।'

যাই হোক তাই হোক পুঁটুলির গতি করতে হবে। কোথায় রাখবি বলতো আকাশ? যাতে কারুর চোখে না পড়ে?

'ছাতের সিঁড়ির কোণের সেই ভাঙা প্যাকিং বাক্সটায় রাখিগেনা, যাতে একগাদা ছেঁড়া জুতো আর খালি শিশি বোতল আছে।...জানো দাদু, দিদা ছেঁড়া জুতোগুলোও ফেলতে দেয় না। বলে, শিশি-বোতলওলা নাকি নেয় '

সর্বাণী এই ভাবে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় রেগে বলেন, নেয় না তো কী বানিয়ে বলছি। সেই ঝাঁকড়াচুল লোকটা তো নিজে থেকেই চেয়েছিল। আবার বলে গিয়েছিল চটিফটিও ফেলে দেবেন না রেখে দেবেন? এসে দেখব! তো আসছে না তো এখনও।

'তাই বেশ ছেঁড়া জুতোর পাহাড় জমে গেছে। যাক্, তার তলাতেই লুকিয়ে রাখি গে। পাগলা যদি সত্যিই নিতে আসে, বলতে হবে হি হি হি, তোমার জিনিস সিন্দুকে তুলে রাখা হয়েছে।'

'সর্বাণী বলে ওঠেন, ছেঁড়া জুতোর মধ্যে? দুর্গা দুর্গা' ওর মধ্যে মা কালীর ছবি রয়েছে না?'

'এই সেরেছে। আবার এক ফ্যাচাং। তাহলে—হি হি দিদা তোমার ঠাকুর ঘরেই রেখে আসি গে।'

'এই আকাশ। কী হচ্ছে? কেবলই দিদাকে জ্বালাতন করার তাল।'

'তো একটা কিছু বল তাহলে? মা কালী আছেন আবার ছুঁলে

নাইতেও হবে।'

'এই ইয়ার ছেলে, আমি তোকে নাইতে বলেছি ?'

'বলনি। নাইলে খুশিই হবে!'

'বলেছি তোকে। একটু গঙ্গাজল মাথায় দিলেই চুকে যায়।?

'দিদা! আবার তোমার গঙ্গাজলের নাম করছ? বলিনি, গঙ্গা এখন ভীষণ 'দূষণ'।'

'তো খেতে বলেছি ?'

'মাথায় ছিটোনোও চলবে না।'

'তো ছিটোসনি। এখন শুগে যা। ভোরবেলা বিজলী আসার আগে নিয়ে এসে কোথাও—'

'দাদু!'

আলো হি হি করে বলে ওঠে, 'দেখছ তোমার গিন্নির কৌশল।' সকালে বিজলী আসার আগে! তার মানে তখন দাদা মুখ ধুয়ে জামাটামা ছাড়বেই।

হ্যাঁ বাসি জামা ছাড়াটা সর্বাণীর নির্দেশে বাধ্যতামূলক। আলো আর আকাশ একটু বড় হয়ে তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার চেষ্টা করে পেরে ওঠেনি। তাদের দাদু বেশ যুক্তিতত্ত্ব দিয়ে বুঝিয়েছেন, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ 'হাইজিনিক', কারণ রাতে ঘুমের মধ্যে মানুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে—

'ভূত জমে? কেমন? সাধে বলি দাদু, তুমি মোহনবাগানের নয়, দিদারও একটি সাপোর্টার।'

'আমার? হায় কপাল! তাহলে আর ভাবনা থাকত না ;

হ্যাঁ, এইরকম পদ্ধতিতে বাক্য বিন্যাসে অভ্যস্ত এরা। তবু সত্যিকারের হুল থাকে না তাতে।

শেষপর্যন্ত রফা ওই আকাশের পড়ার ঘরে যেটা এখন তার শোওয়ার ঘরেও পরিণত হয়েছে, তার চৌকির তলায় ঠেলে রাখা হোক। বিজলী ও ঘরে খুব সন্তর্পণে কাজ করে। দাদাবাবুকে তার বড় ভয়।

*　　　　*　　　　*

রাতে এঘরে সর্বাণী মৃগাঙ্কর কাছ ঘেঁষে শুয়ে বললেন, 'সকালবেলা মুখপোড়া তার জিনিসটা নিয়ে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়বে।'

আটষট্টি বছরের ব্যক্তিটি বাষট্টি বছরের রমণীটির গায়ে বেশ একটু প্রেমকোমল হাত বুলিয়ে বলেন, 'যা বলেছ। শুধু শুধু কী এক উটকো ঝঞ্ঝাট।'

অন্য একঘরে তেতাল্লিশের তরুণটি তার উনচল্লিশের তরুণী প্রিয়াটিকে নিতান্তই নিকটে টেনে নিয়ে বলে. 'ভাবছি লোকটা যদি সত্যিই গুণ্ডা-ফুণ্ডা না হত।'

'কী যে তাও তো বোঝা যাচ্ছে না। সত্যিই যদি জেলপালানো আসামী হয়? তার জিনিসটা বাড়িতে রইল। যদি না নিতে আসে?'

'কে আর জেনেছে? আমরা তো কেউ কাউকে বলে বেড়াব না। না নিতে এলে ধরে নিতে হবে ধরা পড়েছে। আবার গারদে ঢুকে গেছে।'

'তাহলে পুঁটুলিটার কী গতি হবে?'

'হা অদৃষ্ট! ওই একটা ছেঁড়া গামছার পুঁটুলির গতির চিন্তায় এমন সুন্দর রাতটাকে মার্ডার কেস করে ছাড়বে?'

'আহা! ঢং। আর একটু হলে—তো রাত কা রানীই 'মার্ডার কেস' হয়ে যাচ্ছিল মশাই।'

এই চুপ খবরদার ওসব বলবে না। পাজি-টাজি না হয়েও যদি পাগলও হতো! উঃ! ভগবান খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

*　　　　*　　　　*

তা ভগবান যখন বাঁচিয়েই দিয়েছেন, তখন আর রাতের ঘুমের ব্যাঘাত হবার কিছু নেই। সংসার সদস্যগণ শান্তির নিদ্রাতেই রাত কাটিয়েছে, এবং যথারীতি বিজলীর অসহিষ্ণু ভঙ্গির বেল বাজানর দাপটে হুড়মুড়িয়ে নীচে নেমে আসতে হয়েছে সর্বাণীকে।

তবে আজ সঙ্গে সঙ্গে মৃগাঙ্কও নেমে এসেছেন, 'চট করে খুল না' বলতে বলতে।

চট করে খোলা কোনদিনই হয় না, 'আই হোল' দিয়ে দেখেই হয়। যদিও তার জন্যে বিজলীর কাছে ঝঙ্কারও খেতে হয়। তার টাইমের দাম নেই? পাঁচ বাড়ি খাটতে যেতে হয় না? একজনের বাড়িতে দোরে একঘণ্টা কেটে গেলে চলে?

বিজলীবালা বকবক করতে করতে আর ঘোড়া লাফ খেতে খেতে সিঁড়ি উঠে যায়।···আর যদিও গত সন্ধ্যায় এখানে কোন 'মার্ডার কেস' হয়নি, তবু মৃগাঙ্ক আর তাঁর গৃহিণী জায়গাটা ভাল করে অবলোকন করেন, কোন চিহ্ন টিহ্ন পড়ে আছে কিনা দেখতে। দেয়াল ধার থেকে সেই অস্বস্তিকর জিনিসটা সরানো হয়েছে, তবু যেন মনে হচ্ছে তাকালেই ওখানে কিছু একটা দেখতে পাবেন। সেটা যেন রয়েই গেছে শেকড় গেড়ে।

আসলে সেটা শেকড় গেড়ে গেছে মনের মধ্যেই। একটা ঝঞ্ঝাট অথবা বিপদের প্রতীক স্বরূপ! লোকটা যদি এই ফেরে না ফেলে যেত, যদি শুধু আশ্রয়লাভে ব্যর্থ হয়ে চলে যেত, কে তার কথা নিয়ে ভাবতে বসত লোকটা গণপ্রহারে নিহত হল না পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তুলোধোনাই হল? এখন সেটাই ভাবতে হচ্ছে, এবং প্রতিমুহূর্তে তার আসার আশা করা হচ্ছে?

* * *

চায়ের টেবিলেও আবার কথা হল।

'কই এল না তো। বলেছিল সকালবেলাই···'

'এখনও সময় পার হয়ে যায়নি হয়তো ছুট মেরে বেশ কিছু দূরে গিয়ে পড়েছিল।'

'আমি তো বেরিয়ে যাব বাবা, তুমি আজ আর না হয় বেশি—আলো আকাশ আজ তো শনিবার, তোদের ছুটি না?'

'হুঁ।'

'থ্যাঙ্ক গড্! অকারণে রাস্তায় বেরোসনি।'

'আঃ! আশ্চর্য কেন বল তো? যে লোকটা কাল কিচ্ছু করল না, আজ আমাদের রাস্তায় বেরোতে দেখলেই ছুরি বসিয়ে দেবে?'

'আঃ দুর্গা দুর্গা! তোর এই ছেলেমেয়ে দুটো যা হয়েছে না কঙ্ক।'

'না হবে না। তোমার 'খোকাটির' মতো হতে হবে। বাবা তো একটি ভিতুর রাজা!'

আঃ! তোরা একটু থামত! বাবা, বাজারে আজ না হোলেও চলে যাবে—'

কথার মাঝখানে নীচে সদরের কাছাকাছি থেকে বিজলীর কণ্ঠনিনাদ শোনা গেল, অ দাদাবাবু—দেখ সে লুঙ্গিপরা কে একটা লোক তোমাদের খুঁজেছে—নেমে দেখ, আমি চললুম!

তার মানে কপাট খুলে রেখেছ—

এই এক সাংঘাতিক মহিলা!

আলো বলে ওঠে, 'ওই তোমার প্রাণের বোনঝিটিকেও তাড়াও দিদা। অসহ্য।'

'মাসিমা' বলে ডাকে সর্বাণীকে তাই আলো সবসময় ক্ষ্যাপায় সর্বাণীকে তোমার প্রাণের বোনঝিটি বলে।

'ওই এসেছে তাহলে। বাঁচা গেল বাবা।'

বলে নেমে আসেন মৃগাঙ্ক।

করঙ্ক সেইমাত্র খেতে বসেছে।

হ্যাঁ, লুঙ্গি পরাই এবং কে একটা লোকই। সেই প্রতীক্ষিত-জন নয়। দু'পা পিছিয়ে এসে মৃগাঙ্ক বলেন, 'কে? কী ব্যাপার?'

'আজ্ঞে বাবু, একটা কথা ছেল।'

এখন সকালের আলোয় পৃথিবী ভাসছে। এখন রাস্তায় মিছিল! অতএব মৃগাঙ্ক আত্মস্থ থাকার চেষ্টা করেন।…'আমার সঙ্গে আবার কী কথা?'

লোকটা গলার স্বর নামিয়ে বলে, 'বাবু, কাল সন্ধে নাগাদ একটা লোক আপনার বাড়ি সেঁদিয়ে ছেল?'

সর্বনাশ! কী এই অশনি সংকেত?

সকালের আলো তার ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে বসে। রাস্তার জনারণ্যও বুকে তেমন ভরসা জোগায় না। তবু বহিরঙ্গে তো সাহস আনতেই হয়।

কিন্তু মৃগাঙ্ক মৌলিক নামের দীর্ঘদেহী এই আটষট্টি বছরেও সোজা সতেজ লোকটি কি সত্যি খুব ভিতু? তা কখনই নয়। অন্তত আগে তা ছিলেন না। কিন্তু দিনকাল। দেখে দেখেই—

'তা হোক হেলা ভরেই বললেন,' লোক? কী রকম লোক?

'এই আজ্ঞে আমাদেরই মতো।'

'আমাদের।'

চমকে তাকালেন। হ্যাঁ পিছনে আরও একটা ওই একই ধরনের লোক এসে দাঁড়িয়েছে বটে। কিন্তু মৃগাঙ্কর বাড়িটাকে হঠাৎ টার্গেট করল কেন?

তা হোক, বিপদে বুদ্ধি হারাতে নেই।

'আমার বাড়িতে? কখন বলত?'

একেবারে ঝেড়ে জবাব দেওয়াও যায় না। যদি এরা দেখে থাকে লোকটাকে ছুটে এ বাড়িতে ঢুকে পড়তে। তাই আবার বলতে হয়, কখন বলত?

'ওই যে বললুম সন্ধে নাগাদ।'

'কই বাপু। আমি তো ব্যাপারটা, আচ্ছা বাড়িতে জিজ্ঞেস করে দেখি—ওরে—' ডাক দেবার আগেই নেমে এসেছিল সর্বাণী। এসেছে আকাশও।

মৃগাঙ্ক ওদের বুদ্ধির ওপর ছেড়ে দিতে বলে ওঠেন, 'ইয়ে—কাল সন্ধেবেলা এদের মতো কেউ একজন এসেছিল?'

ইশারা কাজ দেয়।

আকাশ বলে, 'কই না তো। দিদা কাল সন্ধেবেলা কি—'

সর্বাণী সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে বলেন, 'কই কেউ তো—কেন বল তো কী হয়েছে?'

'না, কিছু না মানে কাল সন্ধেবেলা ওদিকে হঠাৎ একটা হল্লাবাজি হয়ে—লোকটা খুব দুঃখী বাবু। নিরীহ মনিষ্যি—'

একটু আগে বুকের মধ্যে যে হিসহিস ভাব এসেছিল সেটা আস্তে গরম হতে থাকে।

'তা তো বুঝলাম। তো এখানে ঢুকে এসেছিল বলছ কেন?'

'না বাবু, ইয়ে ওদিকের ওই পানের দোকানের ছেলেটা বলছিল, এইদিকেই কোনখানে যেন ঢুকে পড়েছিল। তো বললো, লোডশেডিং হয়ে গেল কোন বাসা থেকে যে বেরোল, তা বুঝতে পারেনি।'

'ওঃ। লোকটা তোমার চেনা?'

'আজ্ঞে অনেককালের! নাম প্রাণকেষ্ট। তো একটা উটকো লোক এসে কেজিয়া বাধিয়ে হল্লাবাজি করে—ভাবনা হচ্ছে অন্তরালে কোথাও গিয়ে খুন করল, না পুলিশের গাড়ি তুলে নিয়ে গেল।'

গলা শুকোচ্ছে, তবু আলগা প্রশ্ন, পুলিশও এসেছিল?

'আজ্ঞে পুলিশ তো গোড়া থেকেই। সব কারসাজি বলে কিনা প্রাণকেষ্ট বাইরে দুঃখু ধান্দা করে ভিক্ষে-টিক্ষে করে চালায় আসলে নাকি তলে তলে হেরোইনের কারবার করে—শুনুন তো কথা!'

অফিসের সাজে নেমে এসেছে করঙ্ক।

বুঝে নিয়েছে ব্যাপারটা। গম্ভীরভাবে বলে, 'কে কোথায় কী করে, তা আর আমরা শুনে কী করব বাপু? গ্যাখো খুঁজে কোথায় তোমার বন্ধু—বাবা বেরোচ্ছি—'

এও একটি ইশারা!

বাবা দরজা বন্ধ করে ফেলে চটপট।

ওরা অবশ্য ভেতরে এসে ঢুকে পড়েনি। বাইরেই দাঁড়িয়েছিল।

অতএব—

ছেলে যতক্ষণ না রাস্তা পার হয়ে তার জন্যে এসে দাঁড়িয়ে থাকা বাসটাতে উঠে পড়ল, ততক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মৃগাঙ্ক। ছেলের দিকে আবার লোক দুটোর দিকেও। অন্য কোনও আচরণ করছে না তো?

দু'জনে কথা বলতে বলতে চলে গেল।

* * *

আবার একবার বাড়িতে প্রবল আলোড়ন। তর্কের ঝড়।

কী বলিনি? বলিনি লোকটা সত্যিই ভালমানুষ, মারধর খাবার ভয়ে ছুটে এসে ঢুকে পড়েছে। তা নয়, ও সব 'গপ্পো'।

তো এখনই কি সিওর হওয়া যাচ্ছে, গপ্‌পো নয় সত্যি। এই লোক দুটোই যে সত্যি কথা বলছে, তার প্রমাণ কী? কালকের লোকটারই চর হতে পারে।

তাই যদি হবে তো সোজাসুজি বলল না কেন, 'বাবু একটা লোক এখানে তার জিনিস রেখে গেছে, দিয়ে দিন সেটা।' বিশ্বসুদ্ধ সব্বাইকে অবিশ্বাস করতে হবে? পৃথিবীতে ভাল লোক একেবারেই নেই?

আছে অবশ্যই তবে চিনে বার করা শক্ত।

কর্তা-গিন্নির এই চাপান-উতোরের মধ্যে নাতনি ফোড়ন কাটে, 'উঃ! বিচ্ছিরি একটা বাজে লোককে নিয়ে কাল থেকে যা চলছে। তুমিই বা কী ভাল লোক দাদু? স্রেফ ঝেড়ে জবাব দিলে, 'কই, কেউ আসেনি তো।' এটা বুঝি সত্যি কথা হল?'

আকাশ নিজেও দু'একবার তাই ভাবছিল, কিন্তু যেহেতু তার বিরোধীপক্ষ ওটা বলে ফেলেছে, তাই বাধ্য হয়েই উল্টো গাইতে হয় তাকে। বিজ্ঞের মতো বলে, 'বোকার মতো কথা বলিস না। এসেছিল? বলে বসলে—কত রকম ফ্যাসাদে পড়তে হতে পারে তা জানিস তুই? ঠিক সিওর হওয়া যাচ্ছে লোকটা আসলে কী? 'জেল-পালানো আসামী' এ সন্দেহটাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সে তো প্রাণভয়ে আর ধরা পড়ার ভয়ে—এভাবে—'

একেবারে মহামুহূর্তে আলো আর আকাশের জননী আলোচনায় যোগ দিতে আসেনি। করঙ্ক অফিস সাজে নেমে যাওয়া মাত্রই সে পিছুপিছু সিঁড়ির দু-চার ধাপ নেমে এসে সিঁড়ির তলায় দৃশ্যটি অবলোকন করছিল, যেই দেখল করঙ্ক বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোল, সেও ব্যস্তচরণে ছুটেই বলা যায় দাঁড়াতে গেল বারান্দায়। এটাও যথানিয়ম। যেখানে যত কাজেই থাকুক, ওই মার্কামারা বাসটি এসে দাঁড়ানো মাত্রই সুরভিও বারান্দায় এসে দাঁড়াবে এ নীতি বলবত।

বাসটা ছেড়ে যাবার পরও কিছুক্ষণ সেই ফাঁকা হয়ে যাওয়া পথটার দিকে তাকিয়ে থাকে সুরভি। ভিতরেও যেন ওইরকম একটি ফাঁকা

ভাব। এ সময় দু'দশ মিনিট মনটা একটু বিষণ্ণও থাকে। সেই মনটি নিয়ে বারান্দা থেকে সরে রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়ায় সুরভি। এবং একটু শুনেই আলোচনা সভায় যোগ দিয়ে বলে ওঠে, তা সত্যিই তো বাবা, 'হ্যাঁ একটা লোক হঠাৎ ঢুকে পড়েছিল, আর জোর করে এই জিনিসটা গছিয়ে রেখে গেছে, নিয়ে যাও!' বললেই তো শান্তি হত।

মৃগাঙ্ক একটু হাসেন। যদিও তিনি বৌমার চির সমর্থক, তবু এক্ষেত্রে তার কথাটা 'অমৃতং বালভাষিতম্' বলে ধরে নিয়ে হেসে বলেন, 'শান্তি জিনিসটা কি এতোই সুলভ বৌমা? এমনও তো হতে পারে এ লোক দুটো তার বিরোধীপক্ষ। ভালমানুষি দেখিয়ে সন্ধান নিতে এসেছিল। ওদের হাতে দিয়ে দিতাম, আর কাল যদি সে এসে বলত, কই বাবু. আমার জিনিসটা? কী জবাব দেওয়া হত?'

তা যুক্তিটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কাজেই চুপ করে যেতে হয় সুরভিকে। আকাশ বলে ওঠে, 'ফরনাথিং কী যে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার নিয়ে এত ঝঞ্ঝাট। উঃ!'

'ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে এইটুকুই ঘটেছে। আরও ভয়ঙ্কর বিচ্ছিরি কিছুও ঘটতে পারত আকাশ। দেখছ তো চারদিক। খবরের কাগজ-টাগজও তো পড়।'

'বাবাঃ। তোমাদের এই সব ব্যাপারেই ভগবানকে টেনে আনা যে কী এক বিচ্ছিরি ফ্যাসান। তোমাদের ওই ভগবানটি সত্যিই যদি কোথাও থাকেন, তাঁর এত সময় আছে যে, পৃথিবীর এই এত এত কোটি লোকের সব ব্যাপারে নাক গলাতে আসবেন!'

'আরে বাস। বৌমা তোমার এই পুত্তুরটি যে দেখছি বেজায় তালেবর হয়ে উঠেছে! অ্যাঁ। এই তো সেদিন টলে টলে হাঁটছিলিরে আর কোলে চড়বার জন্যে হাত বাড়াচ্ছিলি।'

আকাশ গম্ভীর ভাবে বলে, 'এখনও তেমনি থাকলেই তোমার বেশ খুশি হও তাই না?'

তা এ এমন কিছু না। সারাক্ষণই দাদু আর দিদার সঙ্গে ওদের দুই ভাইবোনের এমন বাকবিন্যাস চলে, তবে এই বাকযুদ্ধটা যে

নেহাতই যুদ্ধ, যুদ্ধ, খেলা মাত্র, তা সকলেই জানে।

তবে সর্বাণী মাঝে মাঝে ভাবেন, এখনও পর্যন্ত তো বেশ, কিন্তু আর একটু বড় হলে কী হবে কে জানে। যা সব বন্ধুবান্ধব। বন্ধুরাই যেন গুরু ইষ্ট ভগবান।

* * *

'লোকটা এসেছিল নাকি?'

বাড়ি ঢুকেই জিজ্ঞেস করল করঙ্ক।

যে দরজা খুলেছিল, সে প্রায় বুকের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। এ হেন সময় এ হেন প্রশ্ন। ভাবাই যায় না। ···এই ক্ষণ মুহূর্তটুকুতো সারাদিনের বিরহের পরের পরম প্রাপ্তি।

পরক্ষণেই তো হাট-এর মাঝখানে। সেখানে বেশ তরতাজা শ্বশুর-শাশুড়ি, বড় হয়ে ওঠা ছেলেমেয়ে! সুরভির সমবয়সি বা সহপাঠিনীদের অনেকেরই সংসারের চেহারা আলাদা হয়তো নেহাতই ক্লাশ থ্রি কি ফোর--এর ছেলেমেয়ে। তাও ছুটোই বা কই? অনেকেরই তো একটা মাত্র। আর মাথার ওপরটি ফাঁকা।

শ্বশুর-শাশুড়ি থাকলেও থাকতে পারে। তবে তারা যে ছেলে বৌয়ের যুগলজীবনের মধ্যে এসে থাকতে বসবে, এমন বেশি দেখা যায় না।

বেশিরভাগই জোড় ভাঙা একজন। তো সেজন হয়তো ছেলের বাড়িতে থাকার চাইতে মেয়ের বাড়িতেই থাকা পছন্দ করে। কিংবা যদি একটা অকৃতি অধম ছেলে থাকে, তার সংসারটাই সুবিধের মনে করে।

সুরভির কেস অবশ্য একটু অন্য। বাড়িটা শ্বশুরের এবং তার বরটা সেই শ্বশুরের একমাত্র সন্তান। তাছাড়া শাশুড়িও বুদ্ধিমতী এবং স্নেহময়ীও। কাজেই অবাধ ফ্রি ভাবের অভাব থাকলেও সুরভির এ জীবনটি অসহনীয় মনে হয়নি। এই যে—দাম্পত্যজীবনে একটু আড়াল আবডাল, একটু ধৈর্য, রাত্রির জন্য প্রতীক্ষা, এরমধ্যেও একটা বিশেষ স্বাদ আছে বৈকি। এখনও যেন তারুণ্যের স্বাদ, নববিবাহ

কালের রোমাঞ্চ। কাজেই সুরভির ওই করঙ্ককে দরজা খুলে দিতে আসার সময়টুকু বেশ কিছু মনোরম।

কিন্তু আজ কি না করঙ্ক বাড়ি ঢুকেই ছুম করে 'সেই লোকটার' প্রসঙ্গ তুলে বসল। আতঙ্ক এমনিই জিনিস।

সুরভি একটু হেসে বলে, 'অফিসে আজ কিছু কাজকর্ম করেছ বলে তো মনে হচ্ছে না। সারাদিন 'সেই লোকটার' ধ্যান করছিলে।'

'না না। যাবার সময় আবার দুটো আগলি চেহারার লোক দেখে গেলাম কি না। যাক্, সারাদিনে নতুন কোন ঝামেলা হয়নি তো ?'

'না তো।'

'আজ তোমার 'সুরঝঙ্কার'-এর দিন ছিল না ?'

'তবু ভাল যে আমাব দিন অদিন সম্পর্কে খেয়াল আছে।'

'নটি গার্ল! এখন একটু গালে টোকা খেল সুরভি। তাও—সিঁড়ির মাথায় কোনও ছায়া আছে কি না দেখে নেওয়ার পর।'

'গিয়েছিল ?'

'যাব না কেন ? শনিবারে তো তিনটে থেকে পাঁচটা।'

'তিনটে থেকে! ওই দুপুর রোদে, রবীন্দ্র সঙ্গীত।'

'উপায় কী ? ঘরের ভাড়াটা তো উশুল করে নেবেন 'ঝঙ্কার'-এর প্রতিষ্ঠাতারা। সাড়ে পাঁচটার শিফ্‌ট থেকে 'উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত' শেখানো হচ্ছে আজকাল।'

'তা ভাল।'

বলতে বলতেই দোতলায় উঠে আসা হয়।

তা করঙ্কর পক্ষে এই সময়টি খুবই মধুর বৈকি।

মা বাবা ছেলেমেয়ে চারটি প্রাণী উন্মুখ হয়ে তার প্রতীক্ষা করছে এমন দৃশ্যটি কি কম সুখের ?

সহকর্মী মনোজের অবস্থার কথা মনে পড়ে যায়।

বয়েসে সামান্য তফাত তবু মনোজের সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা, তাছাড়া লোকটা বেজায় 'গল্পে'। আর নিজের কথায় সাতকাহনও আছে একটু।

আপনার আর কী মৌলিকদা! দিব্যি মা-বাপের বালকপুত্র হয়ে আছেন এখনও, সংসারের কিছুটি আঁচ লাগে না। আর এই অভাগা মনোজ সরকার? সর্বদা সে আগুনে 'বেক' হচ্ছে। সকাল থেকে ডিউটি জানেন? সকালে মশারি গুটিয়ে বিছানা তুলে বোতল হাতে ঝুলিয়ে দুধ আন, থলি হাতে ঝুলিয়ে বাজার কর, চা বানিয়ে খাও, ছেলেকে স্কুলের জন্য তৈরি কর—

ধ্যাত! বানাচ্ছ! মিসেস এর সঙ্গে নন-কোঅপারেশন নাকি?

আরে না দাদা, ঠিক উল্টো। 'কো-অপারেশন বাবদই' বিদেশে না কি স্বামী-স্ত্রী দু'জনে সমানভাবে ঘরকন্নার কাজ করে। মিসেসকেও তো সাড়ে নটায় বেরোতে হয়। তো রান্নার ভারটা যেহেতু তাঁর ঘাড়ে, তাই আমাকে এসব—তবে আপনার মতন কি আর সৌভাগ্য? যে পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে ভাত খেয়ে আসব? সকালের বরাদ্দ হচ্ছে ডিম সেদ্ধ আলু সেদ্ধ কী আরও যদি কিছু থাকে সেদ্ধ, ব্যস! একপাক! আদি ও অকৃত্রিম হিন্দুয়ানি ব্যবস্থা!

মাঝে মাঝেই আবার জিজ্ঞেস করে, আজ কী দিয়ে ভাত খেয়ে এসেছেন মৌলিকদা?

করঙ্ক হাসে। বলে 'নাঃ তোমার কাছে বলতে লজ্জা করছে।'

আবার মাঝে মাঝেই টিফিনের সময় বলে ওঠে, ওহে মনোজ সরকার! আমার কৌটোটায় একটু হাত লাগাও ভাই। জননী এবং গিন্নি উভয়ের ভালবাসার অবদানের ভার একা বহন করা শক্ত হচ্ছে আজ। উঃ! যত বলি এত খাওয়া যায় না, কে শোনে সে কথা। 'এই তো কমই তো দেওয়া হয়েছে' বলে দেখিয়ে, আবার চুপিচুপি কিছু ঢুকিয়ে দেয়।

মনোজের অবশ্য সে টিফিনে হাত লাগাতে খুব আপত্তি থাকে না। এবং বিস্ফারিত নেত্রে বলে, 'এই সকালবেলা এত হয়ে ওঠে অ্যাঁ! লুচি বেগুনভাজা আলু ছেঁচকি, ডিমের ঝাল! উঃ লাকি ম্যান।'

মনোজের সন্ধ্যাকালীন খবরও প্রায় একই।

কাজে হাত লাগাতেই হয় মৌলিকদা, দুজনেই তো রণক্লান্ত

সৈনিক। মিথ্যে বলব না, তিনিই বেশিটা হাল ধরেন! তবে সারা-দিনের চাবিবন্ধ বাড়ি, বাড়ির তিনটে প্রাণীই যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়ে যাওয়ার ফলে বাড়ির যা অবস্থা হয়ে থাকে, তাঁকেই তো ম্যানেজ করতে হয়। কাজের মেয়েটা তো সেই একবার যা সকালে—রুদ্ধ-কপাট ভেদ করে আর ঝাড়ু চালিয়ে যেতে পারে না? তো

'ছেলে? তার তো স্কুল—'

হ্যাঁ একথা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল করঙ্ক। তো মনোজ মহোৎসাহে জবাব দিয়েছিল, 'সে মিসেস বুদ্ধিকৌশলে দিব্যি একখানি ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। পাশের ফ্ল্যাটের মহিলাটির সঙ্গে 'মাসি' পাতিয়ে এমন কব্জা করে ফেলেছেন তাঁকে, তিনিই আমার ছেলেকে স্কুল থেকে বাড়ি আনেন, নাওয়ান, খাওয়ান, সারাদিন দেখভাল করেন, মিসেস বাড়ি ফিরে ছেলেটাকে কালেক্ট করে আনেন।'

'কিন্তু তোমার তো মা আছে বলেছিলে।'

আছেন। তবে কী জানেন মৌলিকদা, তার যে আবার আচার 'বিচার ঠাকুর দেবতা নানান ফ্যাচাং। আমাদের এখানে ঠিক সুবিধে হয় না। মা আর বৌ, দু'জনেই নিজের কোর্টে বল রাখতে চান। একজন বলেন, 'এত অনাচারের মধ্যে থাকা যায় না।' অন্যজন বলেন, '-র বেশি আর সম্ভব নয়।' -- মা তাঁর সোনার গোপালের হাঁড়ির হাল দেখে দুঃখে বিগলিত হয়ে সংসারের হালটা কিছুটা নিজের হাতে নেবার চেষ্টা করতে এলেই, অপরজন বলেন, তাহলে আপনিই হালটা পুরোপুরি ধরে চালান নৌকো, আমি বাপের বাড়ি গিয়ে আরাম খাইগে।' তো দেখলাম সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।'

'কিন্তু সম্মান? সম্ভ্রম? সভ্যতা? লোকসমাজ?'

'সে আর কী করা যাবে? অত দামি দামি জিনিস কি আর সকলের ভাগ্যে সয় মৌলিকদা?'

সয় না। তাই তার মা তার মাসির বাড়িতে বিধবাদিদির সঙ্গে থাকেন। অর্থাৎ বোনপোর সংসারে। টাকাপত্তর অবশ্যই দেয় মনোজ, খানিকটা বৌয়ের গোচরে, কিছুটা তার অগোচরে। সবটা গোচরীভূত

হলেই তো শুনতে হবে, 'মাসতুত ভাইয়ের সংসারটা চালাবার ভারটা তাহলে তুমিই নিয়েছ ?'

কিন্তু মাসতুত ভাইয়েরও তো একটি গিন্নি আছেন ? তার আবার কী ? দুটো বিধবা বুড়ির আলাদা একটি বিশুদ্ধ ডিপার্টমেণ্ট আছে, সে তার ছায়া মাড়াতেও যায় না। তাদের জন্যে মাথা ঘামাতেও যায় না। তার বরের পকেটে টান না পড়লেই হল।

বুড়িরাও অবশ্য কারুর ধার ধারে না। তারা একে অপরের পৃষ্ঠ-বল। দুই বুড়িতে মিলে গঙ্গাস্নানে যায় মন্দিরে যায়, ফেরার পথে নিজেদের মনের মতন বাজার করে আনে, তোয়াজ করে রাঁধে, মৌজ করে খায়, আর বাসনমাজা খারাপ হলে বাসনমাজুনিকে বকাবকি করে, মাজা বাসন আবার মেজে নেয়।·· এবং রাত্রে এক চৌকিতে শুয়ে অর্ধেক রাত পর্যন্ত গল্প করে। তোফাই আছেন তাঁরা।

তা মনোজের বৌও ভাবে 'আমিও তোফাই আছি বাবা!' কখনও কখনও বরের মুখে তার মৌলিকদার বাড়ির গল্প শুনলে বলে, 'রক্ষে কর বাবা। এই বয়সে অত তাঁবে থাকা। বৌটা নেহাত হাবাগঙ্গারাম বলেই বোধহয় চলছে! তোমার প্রাণের মৌলিকদাটির আর কী ?··· গায়ে হাওয়াটি লাগিয়ে চালাচ্ছেন, চারবেলা খ্যাঁটটি দিব্যি খাসা হচ্ছে. রাত্তিরে বৌ-টিকেও হি হি, কজায় পাচ্ছেন।'

তা যে যার জীবনদর্শনে চলে।

* * *

দোতলায় উঠে এসেই করঙ্ক পরিচিত সুগন্ধটি পেল। মায়ের পুজোর ঘরের সন্ধ্যেবেলায় জ্বালা ধূপের গন্ধটি বাতাসে বিরাজ করছে এখনও।··চারদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নির্মল।

আচ্ছা করঙ্কর মার কি শুচিবাই ?

ছেলেটা মেয়েটা বলে বটে, তবে করঙ্কর তো তা মনে হয় না। মনোজের মা তবে—কী ধরনের শুচিবাই ? মজা এই, যারা দিদার 'শুচিবাই' নিয়ে সর্বদা ঠাট্টা করে তারাই কিন্তু সে ব্যাপারে অন্যের একটু ত্রুটি দেখলে তেড়ে আসে। বাপি চটি পরে রান্নাঘরের দিকে গেলে

যে? দিদাকে বলে দেব? মা, তুমি যে বড় ঠাকুরের ঘরে ঢুকলে? তোমার কাচা কাপড়?…বিজলীদি, তুমি ওই নোংরা হাতে চায়ের টেবিলে হাত দিলে? দিদাকে বলে দিচ্ছি রোসো; দাদুকেও ও ছেড়ে কথা কয়না। বলে, 'দাদু তুমি এখানে বসে একমনে সিগারেট খেয়ে ছাই ওড়াচ্ছো যে বড়? …এই জানলা দিয়ে রোদ এলে দিদা আচার শুকোতে দেবেন জান না? দিদাকে আবার কষ্ট করে গঙ্গাজল ছিটোতে হবে।'

কখনও আবার মেয়েটাই, বেশি ঠাট্টা করে বলে, 'হুঁ। দাদু আর যা ইচ্ছে করবেন না কেন? জানেন তো প্রাণের গিন্নিটির কাছে তাঁর সাতখুন মাপ!'

যদিও সাত কেন, একটা খুন মাপেরও তেমন নজির দেখাতে পারে না চট করে তবু বলে। তা দাদুও অবশ্য তার প্রতিবাদ করতে যান না। বরং হেসে হেসে বলেন, 'ওহে বালিকা, জান কি 'সাতহাজার খুন' মাপ করে করে তবে এই 'ছাড়'টুকু পেয়েছি।'

আবার সেটি তাঁর প্রাণের গিন্নির কানে গেলে—তিনি বলে ওঠেন, 'আলো! ওই হাড়নিথ্যুক লোকটির কথা বিশ্বাস করে বসছিস না তো?'

পাকাচোকা আলো বলে ওঠে, 'পাগল হয়েছ? ওকথা কেউ বিশ্বাস করে? তুমি সাতহাজার খুনের পাপে পাপী হতেই পার না।'

অকারণ কথা।

মজা করবার জন্যেই কথা।

সংসারটা যেন একটা 'সুখ সুখ' রেশমি সুতোয় বোনা একটা হালকা ওড়না গায়ে দিয়ে সেটাকে বাতাসে ওড়াউড়ি করে বাড়তি একটা হাওয়া খায়।

তাই ছেলেমেয়েরা অনায়াসেই দাদুকে বলে, 'তোমার প্রাণের গিন্নি', বাপকে বলে, দাদু দিদার 'কোলের খোকা' মাকে বলে, 'বাপির আদুরে বৌটি।' অনায়াসেই বলে।

'বৌটি যদি রেগে বলে, 'আর তোরা কার 'কী' তাই শুনি?

'আমরা? আমরা তো বাড়ির সকলের 'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো।'

বটে? তোমরা তাই?

তাছাড়া আবার কী? যেখানে যা দোষ টোষ হবে সব তো শেষ পর্যন্ত আমাদের ঘাড়ে।

এসময় দুই ভাইবোনে বেশ একতা।

ছেলেমানুষ হলে কী হবে, এরকম বুড়োমানুষি গাঁইয়াভাষা তাদের বেশ রপ্ত। যার জন্যে সুরভির ছোটবোন আড়ালে-আবডালে ঠোঁট উল্টে বলে, হবে না কেন? সারাক্ষণ দুই বুড়োবুড়ির সঙ্গে লেগে পড়ে থাকার ফল। যতসব পাকা পাকা গাঁইয়া কথার চাষ তো তোদের বাড়ি হরদম! আমি তো বাবা ভাবতেও পারব না, আমার মেয়ে এরকম পাকা পাকা কথা মুখ দিয়ে বার করছে।'

এভাবে অপদস্থ হয়ে সুরভি কি আর মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হয় না? সত্যি রুবি যা বলে তা তো মিথ্যেও নয়। রুবির মেয়েটাও তো মামার বাড়িতে গেলে দেখাটেখা হলে আলোকে বলে, 'বাবাঃ! আলোদি তুমি এত কথাও জান, যেন একটা বুড়ি কথা বলছে।

কিন্তু উপায় কী? এ বাড়িতে শুধু গাঁইয়া বলে নয়, সর্বদা যেন কথারই চাষ! রুবিদের বাড়িতে তো এমন নয়।

রুবির শ্বশুর শাশুড়ি না থাকুন একজন জা ভাসুর আছেন বটে বাড়িতে, তো নেহাত দরকারি কথা ছাড়া তো কই কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না। যে যার নিজেকে নিয়েই থাকে। দু'জনেরই একটা করে মেয়ে। সামান্য ছোট বড়। তো দু'জনে দু'স্কুলে পড়ে। গানও শেখে দু'জায়গায়।

'গান' ভাবতে গেলেও মনটা খারাপ হয়ে যায় সুরভির। তার ভাগ্য! সর্বদা গায়িকা মায়ের সঙ্গে থেকে তো কই মেয়েকে গলায় এক লাইনও গান তোলাতে পারল না সুরভি। অথচ বুড়ির সঙ্গে থেকে বুড়োমিটি বেশ শিখল, তবে এ সবই সাময়িক।

কখনও একটু চাপা ক্ষোভ কখনও একটুও চাপা নিঃশ্বাস, কখনও একটু মান অভিমানের আলোছায়া। এ আর কার জীবনেই না থাকে? তবু এই নানা বয়সের ছয় সদস্যে গড়া মৌলিক বাড়িটা এযাবত বেশ

হালকা হাওয়ায় ভেসেই কাটিয়ে আসছিল।

হঠাৎ একদিন একটুখানির জন্যে সেই শকুনের ডানায় ঝাপটা এসে কালো ছায়া ফেলে গিয়ে যেন বাতাসটা ভারি করে দিয়ে গেছে। 'শুধু অকারণ পুলক'টি যেন অন্তর্হিত। সবকিছুর মাঝখানে অদৃশ্য হয়ে আছে যেন একটা ড্যালাপাকানো ভয়।

*　　　*　　　*

এখন করঙ্ক নিত্য সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেই প্রথম প্রশ্ন, 'কেউ আসে-টাসে নি তো?"···অথচ এতোদিন বাড়ি ঢুকেই হাস্যোদ্ভাসিত মুখে বলে উঠত, 'এলাম'।

মৃগাঙ্কর এখন সর্বদা ভাষণ, 'সাবধান বাবা! সাবধান। স্কুলে যাওয়া-আসার সময় কোনও বাজে লোকে কথা কইতে এলে পাত্তা দিবি না।···দেখিস বাবা খুব ভাল করে না দেখে মোটেই দরজা খুলবি না। বন্ধু টন্ধুর কাছে সেদিনের গল্পটা করে ফেলিসনি তো? করিস না বাবা। কে জানে কী থেকে কী হয়। ওই এক জিনিস গছিয়ে রেখে গিয়েই—

প্রতি পদে সকলের মুখে ওই আক্ষেপ। জিনিসটা।

'জিনিসটা' মনের মধ্যে বোঝা হয়ে বসে না থাকলে, সেই এক সন্ধ্যার ঝামেলা ভুলে যেতে দেরি হত না। কিন্তু ভোলা যাচ্ছে না।

অহরহই প্রায় এই সংক্রান্ত কথা। ওই একটা জিনিস রেখে গিয়েই—আর দুটো লোকই বা কী মতলবে—

যদিও ক্লাশ নাইনের এবং ক্লাশ ইলেভেনের দুটো ভাইবোন স্কুল বাসেই যাতায়াত করে, ফালতু লোকের সঙ্গে কথা বলার অবকাশ হবার কথা নয়। এবং যদিও 'ভাল করে' দেখে তবে দরজা খোলার নিয়ম-নীতিটা বরাবরই বলবত। তবু এখনও রোজ বলা চাই।

নাতি নাতনি যতই রাগ করে বলে, সবসময় আর একই কথা শুনতে পারি না বাবা, তোমার বাতিকটা একটু কমাও দাদু। তবু মৃগাঙ্ক না বলে পারল না।

আর সর্বাণী?

তিনি মুখে এ নিয়ে বিশেষ কিছু না বললেও, দু'বেলা শতকাজের মধ্যেও বিজলীবালা যখন আকাশের ঘর সাফ করতে ঢোকে, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে ঢোকেন। এবং বলতে থাকেন, 'দেখ বাছা খোকাবাবুর ঘরের কোনও জিনিস এদিক ওদিক কোর না যেন। রেগে কুরুক্ষেত্র করবে তাহলে।'

অথচ সেই অস্বস্তির পুঁটুলিটিকে আড়াল করতে খাটের তলায় একটা পুরনো ট্রাঙ্ক ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। বিজলীবালা যে ট্রাঙ্ক সরিয়ে খাটের তলা ঝাড়ামোছা করতে বসবে এমন অপবাদ তার শত্রুতেও দেবে না। তবু সতর্কতা। তবু নজর রাখা।

তবে কি আর হাসিগল্প খাওয়া মাথার তরিবত, আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে শাশুড়ি বৌয়ে যাওয়া এসব বন্ধ আছে? তা বলে তাও নয়। তবু ওই যা বলা হয়েছে, পিচঢালা পথের মাঝখানে কোথায় যেন একটা খোন্দল হয়ে বসেছে, অবাধ গতিটা তাই কিছুটা ব্যাহত।

এরাও মানে শাশুড়ি বৌ বাইরে থেকে ঘুরে এসে ইশারায় বাড়ির পাহারাদার মৃগাঙ্ক মৌলিককে শুধোন, কিছু ঘটনা নেই তো? নেই। বাঁচা গেল। কিন্তু লোকটার কী হল?

কী আর? ওই যা ভাবা গিয়েছিল তাই। জেল-পালানো আসামী! আবার ধরা পড়েছে।

কিন্তু পরদিন লোকদুটো বলেছিল প্রাণকেষ্ট লোকটা বড় ভাল বাবু —নিরীহ মানুষ। মিছিমিছি একজন ঝগড়া বাধিয়ে—' বলেছিল, 'হেরোইনের কারবার করে বলে মিথ্যে বদনাম দিয়ে মারতে উঠেছিল।'

'ভগবান জানেন, কোথাও টেনে নিয়ে খুন-টুন করে ফেলেছে কিনা? না কি বেদম মারধর খেয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে।

'রাতটুকু থাকতে দিলে বোধহয় বেচারার—'

তবে ক্রমশই এ প্রসঙ্গ ফিকে হয়ে আসে। দিনরাত সপ্তাহ পার হয়ে মাস, এবং মাসও গড়িয়ে অপর মাসে গিয়ে পৌঁছয়।

ভয়ঙ্কর একটা শোকে আচ্ছন্ন ভারাক্রান্ত সংসারও তো ক্রমেই হালকা হয়ে আসে।

এখন ক্রমশ 'প্রাণকেষ্ট' একটা কৌতুকের ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

দরজায় বেল বাজলে তুষ্টুরা বলে, 'দাদু দেখো গে বোধহয় তোমার প্রাণকেষ্ট! হাসপাতাল থেকে ছাড়ান পেয়ে গিয়ে—'

নয়তো বলে 'তোমার প্রাণকেষ্ট আর এসেছে বাপি, পুঁটুলিটা এবার ফেলে দাও।'

সর্বাণী বলেন, ফেলে দেওয়া হবে? কেন ওটা তোদের কী করছে? কামড়াতে আসছে?

'কামড়েই তো বসে আছে দিদা। সেটাই ছাড়াতে চাইছি। রোজ খাটে শুতে ওঠবার সময় ঠিক মনে পড়ে যায় ওর তলায় প্রাণকেষ্টর পুঁটুলি ঘাপটি মেরে বসে আছে। কেমন যেন লাগে!'

সুরভিও তার বরকে বলে, তা তুমিই তো বলেছিলে না এলে গঙ্গায় ফেলে দেবে ওটাকে!

দিলেই হয়। তবে ভাগ্যক্রমে এমন না হয়ে বসে, যেদিন ফেলে দেওয়া হল, তার পরদিনই এসে হাজির হল!

তাও অসম্ভব নয়।

তুচ্ছ একটা ছেঁড়া গামছার পুঁটুলি, ওটাকে ভুলে গেলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

যায়। কিন্তু একেবারে ভুলে যাওয়া তো যাচ্ছে না। বর্ষার থিতোনো জলটা সরে যাওয়ার পর তলায় জমে থাকা শ্যাওলার মতো একটা ক্লেদাক্ত কুদৃশ্য হয়ে চোখের সামনে পড়ে আছে।

'বাপি, তোমার প্রাণকেষ্ট আর আসবে তোমার বিশ্বাস?'

'দ্যাখো, তোমার প্রাণকেষ্ট আর আসবে না।'

'মা আপনাদের প্রাণকেষ্ট কী যে করল!'

প্রাণকেষ্ট যে 'কার' তা কে কাকে বলেছে? কে জানে। অথচ পরস্পরের মধ্যে কথার মাত্রা তোমার প্রাণকেষ্ট।

এমনকি আলোটা হি-হি করে হেসে বলে, দাদা তোর প্রাণকেষ্টকে

আর প্রাণধরে তাড়াতে পারছিস না ?

পারব না কেন ? প্রভুদের পারমিশন পেলে এক্ষুনি বিদেয় করি। তো যেই বলব এবার ওটা ফেলে দিইগে, অমনি সবাই হাঁ-হাঁ করে উঠবেন, আর দু'চার দিন দেখাই যাক না।

কিন্তু আর দু-চারদিন দেখা আর হল না, একদিন সকালে আকাশের আকাশ-ফাটানো আর্তনাদ শোনা গেল, মা! দিদা। আমার পায়ের ওপর দিয়ে ইঁদুর চলে গেল। খাটের তলায় ঢুকে গেল। ওরে বাবারে!

ইঁদুর শব্দটা এমন কিছু অশ্রুতপূর্ব নয়, কত পরিষ্কার করা সত্ত্বেও ভাঁড়ারে রান্নাঘরে মাঝে মাঝেই হঠাৎ হঠাৎ তাদের দর্শন ঘটে। কিন্তু শোবার ঘরে। আবার আকাশের পায়ের ওপর দিয়ে শর্টকাট করতে চেয়েছে সে!

ছুটে এল মা। এলেন দিদা। অতঃপর দাদুও।

'ইঁদুর! অ্যাঁ? বিছানার ওপর? কী সর্বনাশ। খাটের তলায় ঢুকে গেল। সেরেছে! নিভৃতে বসে সেই পুঁটুলিটা কাটছে না তো?'

টেনে বার করা হল ট্রাঙ্কটাকে। ঠিক তাই। অপরাধীকে অবশ্য দেখা গেল না, তবে তার অপরাধের চিহ্নটি দেখা গেল। খাটের তলায় কুচি কুচি লালচে গুঁড়ো। ছেঁড়া গামছাকে আরও ছিঁড়েছে।

'আমি এক্ষুণি ওটাকে ফেলে দিয়ে আসছি—,

আকাশ ঘোষণা করে ওঠে।

'তো তাই দে বাবা। কিন্তু ফেলবি কোথায়? হঠাৎ রাস্তায় এরকম একটা কিছু ফেলতে দেখলেই তো লোকের কৌতূহল হবে।'

'রাস্তায় কেন? কাগজে মুড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিচ্ছি গিয়ে। বিচ্ছিরি একটা নোংরা জিনিস, আমার ঘরে পুরে রাখা হয়েছে। আর যেন জায়গা ছিল না। ফেলে দিয়ে এসে আর কাজ। আলো একটা পুরনো খবরের কাগজ আন্ তো।'

পায়জামার ফালি লটপটিয়ে হঠাৎ 'তে ধ্যাঙড়া' লম্বা হয়ে ওঠা আকাশ বীরবিক্রমে ট্রাঙ্কটাকে আরও টানে।

সর্বাণী বলে ওঠেন, 'ডাস্টবিনে? ভেতরে মা কালীর পট রয়েছে না?'

'ধেত্তারি! তোমাদের যত্তোসব! তিনি এখনও আছেন না ইঁদুরের পেটে গেছেন, তা কে জানে। ঠিক আছে তোমার প্রাণের প্রাণকেষ্টর প্রাণের পটকে বার করে রেখে যাচ্ছি। ইচ্ছে হয় তোমার ঠাকুর ঘরে তুলে নিয়ে গিয়ে পুজো করোগে।'

সর্বাণী নাত্তির মেজাজ দেখে সরে পড়েন।

উপস্থিত সকলেই আবার নিজ নিজ কাজে চলে যায়।

সুরভি বরকে বলে, 'নাঃ সত্যি, আর রাখার কোনও মানে হয় না।'

বর বলে, 'তা ঠিক। আর রেখে দেওয়ার মানে হয় না। তা ছাড়া ওই তো ইঁদুরে কুচোচ্ছিল।'

ইঁদুর আরশোলার হাত থেকে বাঁচাতে—একটু হেসে বলে, প্রাণকেষ্টকে তো আর আলমারিতে তোমার শাড়ি মহলে তুলে রাখা যায় না। এরপর এসে পুঁটুলি ক্লেম করলে ঝেড়ে জবাব দিয়ে দেওয়া হবে 'কে বাপু তুমি? জন্মেও তোমায় দেখি টেখিনি। কিসের পুঁটুলি? রেখে দিয়ে গিয়েছিলে তার প্রমাণ কী? সাক্ষী কই?'

সুরভি হেসে গড়িয়ে বলে, এমনভাবে 'ডায়লগ্‌টি' আওড়াচ্ছো যেন আমিই প্রাণকেষ্ট।

ওদিক থেকে রান্নাঘরের মধ্যে থেকেই বোধহয় সর্বাণীর চাঁচাছোলা গলাটি ধ্বনিত হয়, 'এই আকাশ! ডাস্টবিনের ধারে যাবি তো এইবেলা বাসি জামাটামা ছাড়বার আগেই চলে যা! এসে একেবারে বাথরুমে ঢুকে মুখহাত ধুয়ে—'

মৃগাঙ্ক বলে ওঠেন, আচ্ছা, আচ্ছা তাই করবে। জানই তো ওসব বললেই আরও ক্ষেপে যায়। ওর কী আর নোংরা পরিষ্কার জ্ঞান নেই?

নাত্তির মেজাজ ঠাণ্ডা করতে, একটু তোয়াজি কথা বলতেই হয়।

এই পরিবেশে, পরিস্থিতিতে, আবার একটা আর্তনাদ ওঠা উচিত নয়, কিন্তু উঠল।

এবারের আর্তনাদ আলোর।

পুরনো খবরের কাগজ খুঁজতে বোধহয় তার একটু সময় লেগেছিল। ফেলে দেবার ব্যাপার যখন, দেখতে হবে কোনও দরকারি কথাটথা আছে কিনা। কিন্তু দাদার ঘরে গিয়ে আর্তনাদ কেন? দেরি দেখে দাদা আচমকা চুল টেনে দিয়েছে? না কি থাপ্পড় কষিয়েছে?

না তা নয়।

আলোর আর্তনাদের ভাষা হচ্ছে, 'মা বাপি দাহু দিদা, শিগগির এস, পুঁটুলি খুলে দাদা অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

'অজ্ঞান হয়ে গেছে? পুঁটুলি খুলে? ওমা কী সর্বনেশে কথা? কী ছিল গো। বিষটিষ নাকি? অ বৌমা। অ কঙ্ক!'

'আঃ মা। থামো। দেখছি—চেঁচামেচি কোর না।'

ছুটে আসে সবাই। এবং এসে সকলেই প্রায় জ্ঞান হারাতে বসে।

এ কী! কী সর্বনেশে ব্যাপার!

এই জিনিসটা এইভাবে ছ'মাস পড়ে আছে এখানে?

মৃগাঙ্ক বলেন, 'চুপ! টুঁ শব্দটি নয়! তোমাদের বিজলী বিদায় হয়েছে?'

'হুঁ! সে তো কুড়ি মিনিটেই কাজ সেরে লাফ দিয়ে চলে যায়।'

'যাক। বাঁচা গেছে।'

সুরভি বসে পড়ে বলে, 'আমার মাথা ঘুরছে!'

আলো মায়ের পিঠ আঁকড়ে ভয় ভয় চোখে তাকিয়ে থাকে! সত্যিই অজ্ঞান হয়ে যায়নি অবশ্য আকাশ। তবে অজ্ঞানের মতো বটে। এখন ভাঙাভাঙা গলায় বলে ওঠে, দাহু! এখন কী হবে -

* * *

কিন্তু কী ছিল প্রাণকেষ্টর পুঁটুলিতে?

ছোরা? ছুরি? পিস্তল? বোমা?

নাঃ। কিন্তু তার থেকে কি কিছু কম ভয়ঙ্কর?

প্রাণকেষ্টর মাকালীর পটের নীচে পাট করে রাখা দুটো লুঙ্গির পাটের মধ্যে গোছা গোছা একশো টাকার নোটের বাণ্ডিল। সেলাই

করে করে আঁটকানো। ময়লা ফর্সা। বেশির ভাগই ময়লা।

কিন্তু টাকা কি ময়লা হয়ে গেলে দাম হারায়?

টাকার ময়লা ফর্সা নেই।

সমস্ত পৃথিবী যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

যেন যুগ যুগান্তের পরে সেই নিঃসীম নিস্তব্ধতা ভেঙে কর্কশ বলে ওঠে বাবা। এখন উপায়?

মৃগাঙ্ক মৃদু গম্ভীর ভাবে বলেন, সরিয়ে রাখতে হবে। তারপর বিবেচনা করতে হবে।

অতঃপর মৃদু গুঞ্জন। একাধিক কণ্ঠের।

খুব ভাগ্যিস এগুলোও ইঁদুরে কুচিয়ে ফেলেনি।

আর কিছুদিন পড়ে থাকলে তাই ফেলত।

খুব বোকামি হয়েছিল আমাদের। জিনিসটাকে তখনি ভাল করে না দেখে—এভাবে ফেলে রাখা।

বাবা! তার মানে বোঝাই যাচ্ছে তোমার প্রাণকেষ্ট যুধিষ্ঠিরের নয়।

তাতো যাচ্ছেই। তার মানে পরদিন সকালে যে লোক ছুটো এসেছিল, তারা যা বলেছিল তাই। ফুটপাথে ভিখিরির মতো পড়ে থেকে ওই হেরোইন লেনদেনের কারবার চালাত। খুব সম্ভবত দলের সঙ্গে 'বখরা' নিয়ে ঝগড়া হওয়ায়—

তাই মনে হচ্ছে। এরকম ক্ষেত্রে ছুরি নিয়ে তাড়া করে আসাই স্বাভাবিক।

হ্যাঁ। ওই সব কারবারেই টাকার খেলা!

কথা চলতে থাকে পিতাপুত্রে।

হঠাৎ আকাশ বলে ওঠে, আমার ঘর থেকে নিয়ে যাও এগুলো। দেখে আমার ভীষণ ভয় করছে। বিচ্ছিরি লাগছে।

আলো বলে ওঠে, আমারও। গা শিরশির করছে।

সকলেরই তো তাই করছে। সেইজন্যে হাত দিতে হাত এগোচ্ছে না।

একটু পরে সর্বাণী বলে ওঠেন, কঙ্ক তোর তো বাবা অফিসের সময় হয়ে এল।

কঙ্ক হতাশভাবে বলে, আজ আর বোধ হয় অফিস যাওয়া হবে না। তোমাদের এই বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে কী করে? কে বলতে পারে, আজই হঠাৎ পুলিশ এসে বাড়ি সার্চ করতে চাইবে কিনা?

সুরভি চমকে বলে, পুলিশ? পুলিশ কেন?

কেন, তা কে বলতে পারে। এতদিনের মধ্যে যে আসেনি, সেটাই ভাগ্য। এলে কি খাটের তলা দেখত না?

কিন্তু এখন তো আর খাটের তলায় ঢোকানো নেই, ঘরের মেঝেয় ছড়ানো পড়ে আছে। আশ্চর্য! এই বাণ্ডিল বাণ্ডিল নোট কীভাবে আমাদের চোখ এড়িয়ে—

ওই যে—তোমাদের মা কালীর পট। ওটি হচ্ছে চোখে ধুলো দেওয়ার কলকাঠি!

ঠিক। ধুরন্ধর লোক।

ছেলেই যখন অফিস যাবে না তখন আর সর্বাণীর তাড়া কী? নাতি-নাতনি দুটোই কি স্কুলে যাবে?

আলো বলে ওঠে, না বাবা। আমিও বাপির মতো কামাই করছি। আমার যা ভয় করছে। যদি বন্ধুদের কাছে বলে ফেলি!

তাহলে আকাশই বা কেন? একযাত্রায় পৃথক ফল কী জন্যে? তবে তার ঘর থেকে এই ভীষণ জিনিসগুলো নিয়ে যাওয়া হোক।

সর্বাণীর নির্দেশ, কাঁচি দিয়ে সেলাই কেটে বাণ্ডিলগুলো আলাদা করে ফেলে, গঙ্গাজল ছিটিয়ে বিশুদ্ধ করে নিয়ে বাক্স আলমারিতে বা কোথাও তুলে ফেলা হোক। আর ওই জিনিসগুলো—গেঞ্জি, লুঙ্গি—

নাঃ। ওসব আর এখন বাড়ির বাইরে না নিয়ে যাওয়াই ভাল!

প্রমাণ লোপেব চিন্তা মাথায় খেলতে থাকে করঙ্ক আর মৃগাঙ্কর।

আমার মনে হয়, কাঁচি দিয়ে কুচিয়ে কাদা টাদা মাখিয়ে কাগজ মুড়ে নিয়ে গিয়ে—

আমার মতে আদৌ বাড়ির বাইরে না নিয়ে যাওয়া। কে জানে কেউ কোথাও থেকে বাড়িটাকে ওয়াচ করে কিনা!

এতদিন ধরে?

তা কি বলা যায়? সন্দেহজনক কিছু দেখেনি বলেই এসে চেপে ধরতে পারছে না। হঠাৎ ডাস্টবিনে কিছু ফেলতে দেখলে—

অতএব?

প্রমাণ লোপের সহজ উপায়? সে তো পড়ে আছে। আগুন;

আগুনই সর্বলোপী। কিন্তু আগুনের শরণ নিতে বসলে তো আগুন তার ধর্ম পালন করবে। কাপড়পোড়া গন্ধ বেরোবে।

সেও একটা কথা।···হয়তো পাড়ার লোকের নাকে যাবে। তারা জিজ্ঞেস করতে আসবে—

বাড়ির প্রতিটি লোকের মনোভাব ক্রমশ খুনির মতো হয়ে উঠতে থাকে। খুনের পর কী ভাবে প্রমাণ লোপ করা যায় সেই চিন্তায়— যেমন খুনির মাথায় খেলতে থাকে, সেইভাবে মাথা খেলাতে থাকে বড় থেকে ছোট।

আচ্ছা হ্যাঁরে কঙ্ক, এমন কোনও রকন অ্যাসিড ফ্যাসিড পাওয়া যায় না যাতে জিনিসগুলো পুড়ে গলে যাবে, অথচ গন্ধ বেরোয় না! অ্যাসিডে তো শুনেছি—

ও বাবা! তোমার মাথাটি তো কম নয়।···কর্তা এরমধ্যেই হাসেন। কঙ্ক, তোর মায়ের মাথাটা দেখছিস? কিন্তু—দু'টো লুঙ্গি একটা গেঞ্জি একটা গামছা, এতগুলোকে গলাতে পারবে, অ্যাত অ্যাসিড পাওয়া যাবে কোথায়? আমার মনে হয় গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসাই সবথেকে সেফ্।

কিন্তু ফেলতে যাওয়াটা মোটেই সেফ্ নয় বাবা। গঙ্গা তো আর নির্জন সৈকত নয়। যে দেখতে পাবে, সেই জেরা করবে বসতে, কী

জিনিস কী বৃত্তান্ত।··· তবে হ্যাঁ, ছিঁড়ে কেটে টুকরো করে, দূরে শহরতলীর বাইরে কোথাও গিয়ে কোনও পুকুর টুকুরে—

সেটা আবার কে যাবে ?

মৃগাঙ্কর ঘোষণা আমি অবশ্য যেতে পারি। তবে—

না বাবা না।···

সুরভি ব্যাকুলভাবে বলে, আপনি একা ওভাবে একটা দারুণ রিস্ক নিয়ে—না ভীষণ ভাবনা হবে আমাদের।

করঙ্ক ভেবেচিন্তে বলে, একটা কাজ করা যেতে পারে। একদিনে না পুড়িয়ে, যদি ছিঁড়ে কুচিয়ে রেখে রোজ একটু একটু করে পোড়ানো যায় কেরোসিন ঢেলে তাহলে বোধহয় কাপড়পোড়া গন্ধ বা ধোঁয়াটোয়া বিশেষ—

করঙ্কর এই গভীর চিন্তার ফসলটিকে তার মা নস্যাৎ করে দেন, এ মা মা! রোজ রোজ কে ওই নোংরা জিনিসগুলো ছুঁয়ে মরবে রে ?

আলো হঠাৎ বলে ওঠে, বাড়িতে যদি বাগান থাকত, তাহলে আর কোনও ভাবনা থাকত না।

বাগান থাকলে ? বাগানে কী ?

কেন, রাত্তিরের অন্ধকারে গভীর একটা গর্ত করে তারমধ্যে পুঁতে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে তার ওপব গাছ পুঁতে ফেললেই—

আলোর দাদা অবজ্ঞার গলায় বলে, এটা কোনও একটা গোয়েন্দা গল্প থেকে টুকলিফাই করলি মনে হচ্ছে। নিজের মাথা বলে তো কিছু নেই। আমার মতে ওগুলোকে অন্য অন্য রঙে রং করে ফেলে চেহারা পাল্টে অন্য পাড়ার কোনও ভিখিরি টিকিরিকে দিয়ে দেওয়াই হচ্ছে বেস্ট।

আকাশ আজকাল আর কোনও ব্যাপারে 'মনে হচ্ছে' না বলে, 'আমার মতে' শব্দটাই ব্যবহার করে।

অবশ্য তার মত শুনে এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও বড়রা হেসে ফেলে বলে, সত্যি কী সোজা উপায়।

হাসে তবে সবাই আরও পন্থা আবিষ্কার করবার চেষ্টা করতে থাকে।

একটা হত্যাকারী দল, কোনও একটা লাশ পাচার করার ব্যাপারে এর থেকে কত আর বেশি মাথা ঘামায় ?

কিন্তু ওই তুচ্ছ বস্ত্রখণ্ডগুলোই কি একমাত্র বিভীষিকা ? বিরাট বৃহৎ একটা দৈত্যের লাশ পড়ে নেই এদের সামনে ? তাকে কোথায় পাচার করা হবে রাতারাতি ?

তা দৈত্যই বলা চলে বৈকি।

অথচ একে পাচার করবার সহজ উপায় তো আগুনও নয়, জলও নয়। ডাস্টবিনও নয়।

বাহান্ন হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিল, কেউ 'বিপদের' ভয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসতে পারে ? অথবা আগুনের মুখে সমর্পণ ! কিম্বা কাদা মাখিয়ে ডাস্টবিনে বিসর্জন ? বিপদ সামলাতে জ্যান্ত মানুষ সদ্যোজাত শিশু সম্পর্কেও এমন ব্যবস্থা নেওয়ার ঘটনা আকছার ঘটছে ? কিন্তু টাকা ? মা লক্ষ্মীর প্রতীক। নাঃ। তা হয় না। হ্যাঁ। নিরীহ চেহারার সেই ছেঁড়া গামছার আড়ালে আত্মগোপন করে এই দীর্ঘদিন খাটের তলায় পড়েছিল ওই মোটা অঙ্কের টাকাটা। পরিস্থিতির হিসেবে যা অবিশ্বাস্য।

টাকার আর এক নাম নাকি 'লক্ষ্মী'। যাঁর মুখে প্রসন্ন হাসি, চোখের দৃষ্টিতে বরাভয়। তিনি বল বুদ্ধি ভরসা। তো সে তো যখন তিনি চতুর্দোলায় চড়ে মহিমাময়ী মূর্তিতে সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন। কিন্তু যখন, বা যদি খিড়কির দরজার দেয়াল কোণের ইঁদুর ছুঁচোর গর্ত দিয়ে ঢুকে পড়েন ?

তখন কি আর বরাভয় থাকে ? বরং বলতে হয় বড় ভয়। তাঁর সেই পথভ্রষ্ট আবির্ভাবে প্রতিক্ষণ বিপদের পদধ্বনি ! সর্বনাশের সঙ্কেত !

মৃগাঙ্ক মৌলিক আর সর্বাণী মৌলিকের হাতে গড়া এই ছয় সদস্যের সংসারটির গা থেকে সেই সুখ সুখ সুতোয় বোনা হালকা ওড়নাখানা উড়ে গেছে একটা বিচ্ছিরি ঝোড়ো বাতাসে। তার জায়গায় যেন হাঁফ ধরানো একখানা ভোটকম্বল চেপে বসে আছে সংসারটার ওপর।

কেউই এরা চোর নয়, জোচ্চোর নয়, খুনে গুণ্ডা নয়।

তবু সকলেরই যেন প্রাণের মধ্যে সর্বদাই একটা ধরাপড়ার আশঙ্কায় কণ্টকিত আসামীর অনুভূতি।

প্রাণের মধ্যে সর্বদা বিপদের ঘণ্টাধ্বনি।

কানের পর্দায় সর্বদা পুলিশের পদধ্বনি।

যেন যে কোন মুহূর্তে পুলিশ এসে পড়তে পারে তার বেটনখানা লুকোতে লুকোতে হিংস্র হাসি হেসে বলে উঠতে পারে, কী মশাই? ভেবেছেন টাকাগুলো ব্যাঙ্ক লকারে লুকিয়ে রেখে ফেললেই পার পাওয়া যায়?

এখন তাই সকলেরই সর্বদা চিন্তা, 'আহা, যদি এটা না করে 'ওটা করা হত!'

* * *

তাই এখন সেই তেতাল্লিশ বছরের যুবকটি কোনদিন খেয়াল করে না তার সুন্দর সুন্দর রাতগুলো মার্ডার কেস হয়ে যাচ্ছে।··· এখন তার 'রাতকারানির' সঙ্গে কথোপকথনের বিষয়বস্তু প্রায়শই এই—আচ্ছা টাকাগুলো ওভাবে ব্যাঙ্ক লকারে ঢুকিয়ে রেখে না এসে পুলিশের কাছে জমা দিয়ে দিলেই তো হত! বলা হত না হয়, হঠাৎ রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি।

তা আর নয়। পুলিশ সেই গপ্পো বিশ্বাস করবে? জেরায় জেরবার করে তুলোধুনে ছাড়বে না? জানো না—'বাঘে ছুঁলে যতগুলো ঘা, পুলিশে ছুঁলে তার তিনগুণ ঘা।'

তাহলে বাপু টাকাগুলো কোনও মাঠে মিশনে দান করে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। সর্বদা 'ভয়' নিয়ে বাস করতে হয় না।

তোমার বুঝি ধারণা, তাহলেই ল্যাঠা মিটে যায়? ইনকাম ট্যাক্স-এর দপ্তরে হিসেব দাখিল করতে হবে না, হঠাৎ এতগুলো টাকা কোথায় পেলে হে?

বাঃ। আমরা যদি একটু একটু করে জমিয়ে থাকি?

হা হা হা। তা সেটা ব্যাঙ্কের পাশ বইতে না জমিয়ে ব্যাঙ্ক লকারে

কেন ? গ্রামের নিরক্ষর চাষিবাসি ? তা তারাও আজকাল—

আহা। আমার টাকা আমি যে ভাবে ইচ্ছে জমাতে পারি, খরচ করতে পারি।

না হে চাঁদু। আইন অত সরল বস্তু নয়। টাকা জিনিসটা কোন সময়ই 'তোমার নয়। কোথা থেকে পাচ্ছ, কী ভাবে খরচ করছ, সরকারকে 'দেয়টা' দিচ্ছ কিনা এসবের নিখুঁত হিসেবটি দাখিল করতে না পারলে পার পাবে নাকি ?

'ওঃ। এতই যদি আইন, তবে সারাক্ষণ এত বেআইনি কাণ্ড কারখানা চলছে কী করে হে মশাই ? এই তো শুনি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি। বেআইনটাই আইন হয়ে উঠেছে—'

ওসব আমাদের মতো অভাগাদের জন্যে নয় সুরভি! ওসব ভাগ্যবানদেব জন্যে। এই সমাজ সমুদ্রে আইনের জাল আষ্টেপিষ্টে বিছোনো আছে বটে, তবে জালটার বুনুনি হচ্ছে নেহাতই গুলি সুতোর! স্রেফ এই চুনোপুঁটিরাই সে জালে ধরা পড়ে মরে। রুই কাৎলা রাঘব বোয়ালরা অনায়াসে ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ে, আবার প্রেমসে মহাসমুদ্রে সাঁতার কেটে বেড়ায়।

তাহলে ? কী করা ?

সেই তো ?

আটষট্টি বাষট্টির মধ্যেও ওই একই আলোচনা।

টাকাগুলো যেন বুকের মধ্যে কাঁটা হয়ে আছে বাপু। ওভাবে নিজের লকারে পুরে না রেখে, একটু একটু করে গরিব দুঃখীকে বিলিয়ে দিলেই ভাল হত!

কী আশ্চর্য! বিলিয়ে দেবারও তো অধিকার থাকা দরকার ? কার জিনিস কে বিলোয় ?

যার জিনিস সে যখন আর এল না।

তাহলেও বিবেকের কাছে তো একটা জবাব আছে।

তো বলছ তো লোকটার বেআইনি নেশার জিনিস লেনদেনের

কারবারের টাকা। না হলে রাস্তার একটা ভিখিরি অত টাকা পাবে কোথায়? তাহলে? পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তেই যাক!

- পাপটা যে করেছে, প্রায়শ্চিত্তটা তো সেইই করবে? না কি? তুমি আমি করব?

জানি না বাপু। টাকাগুলো যেন সব সময় হুল ফুটিয়ে বসে আছে। মুখপোড়া লক্ষ্মীছাড়া যে কী 'শনি' হয়েই এসেছিল সেদিন!

'আকাশ' আর 'আলো' নামক দুটো প্রাণীর মধ্যেও কথোপকথনের দৃশ্য আছে।

তবে সে কথোপকথনের মধ্যে আকাশের উদারতা এবং আলোর উজ্জ্বলতা খুঁজে পাওয়া শক্ত।

আমি হলে টাকাগুলো মনের আনন্দে খরচ করতাম বাবা। বুঝলি?

খরচা করে ফেলতিস? মনের আনন্দে?

কেন নয়? আমি অত সেন্টিমেন্টের ধার ধারি না। টাকা হচ্ছে খরচ করবার জন্যে।...তুলে রাখবার মানে হয় না। ওই তো প্রাণকেষ্ট! ছেঁড়া জামাকাপড় পরে ভিক্ষে করে খেয়ে কাটাত, আর টাকা জমিয়ে লুকিয়ে রাখত। তো শেষপর্যন্ত কী হল?

তা সত্যি রে দাদা। যার অতগুলো টাকা রয়েছে, সে কিনা ফুটপাথে শুয়ে—

কী ভাগ্যি যে হি হি স্টোনম্যানের শিকার হয়ে বসেনি।

কার শিকার হয়েছে কে জানে। বেঁচে থাকলে কী আর আসত না? ওই টাকাগুলো ফেলে রেখে গিয়ে প্রাণকেষ্টর প্রাণ ছটফট করত না?

তা ঠিক। মরেটরেই গেছে মনে হয়। অথচ টাকাগুলো খরচা করা হচ্ছে না।

দাদা। হি হি, খরচা করতে বসলে যদি প্রাণকেষ্টর ভূত এসে গলা টিপে ধরে? টাকার টানে মরে গিয়ে ভূত হয়ে দেখতে আসার

গল্প আছে।

তুই বুঝি ভূতপ্রেত বিশ্বাস করিস? তা করবিই তো। যেমন বুদ্ধি! মগজে স্রেফ গোবর।

আঃ। দাদা। ভাল হবে না বলছি।

মন্দই হোক। বলি, তোর ইচ্ছে হয় না অন্তত এক বাণ্ডিল নোট নিয়ে ফেলে বেশ ইচ্ছেমতো খরচা করি?

তা' মিথ্যে বলব না রে দাদা। একবার একবার করে। মনে হয়, আহা, যখন সেই সেলাই কেটে কেটে খাটের ওপর রাখা হচ্ছিল, তখন যদি একটা বাণ্ডিল গড়িয়ে পাশেটাশে কোথাও পড়ে যেত। বড়রা দেখতে পেত না। বেশ হত। তোতে আমাতে দু'জনে যা খুশি করতাম। তা' তখন যা ভয় করছিল! উঃ!

সেই তো। অতো ঘাবড়ে না গিয়ে যদি বলতাম. বাপি, দাদু এগুলো যখন আমার আবিষ্কার, তখন প্রাইজ হিসেবেও আমি কিছু নিয়ে নিতে পারি। আসলে হঠাৎ অতগুলো দেখে—

আচ্ছা দাদা ধর তুই কিছু নিয়ে নিতিস, কী করতিস?

কী করতাম? হাঁদার মতো কথা বলিস না। করবার মতো জিনিসের অভাব আছে পৃথিবীতে? কত কীই তো ইচ্ছে করে। কোন ইচ্ছেটাই বা মেটে? ধর যদি বড়রা অত সেন্টিমেন্টের ধার না ধেরে ও থেকে আমায় একটা মোপেড কিনে দিত! ইস। আঃ!

দাদা রে! যা বললি! উঃ। তুই মোপেড হাঁকিয়ে যাচ্ছিস, ভেবেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। বন্ধুদের তাক লাগিয়ে দেওয়া যেত।

তাক লাগানো আবার কী! আমার বয়েসের অনেক ছেলেরই অমন একখানা মোপেড্ ফোপেড্ থাকে। আমাদের বাড়ীটিই না যা একখানা। একেবারে ন্যাবামার্কা! সবকিছুতেই ভয়। আমাদের কিস্যু হবে না।

তো দাদুকে বলে ছাখ না দাদা?

বলে আর কী হবে? নিশ্চয় সততা সম্পর্কে একখানি লম্বা লেকচার শুনতে হবে। অথচ টাকাটা চুরি করে পাওয়া হয়নি।

কাউকে ঠকিয়েও নয় এমনকি লোকটা 'টাকা আছে' বলে গচ্ছিত রেখেও যায়নি।

ঠিক। তাহলে অবশ্য নিয়ে নিলে 'বিশ্বাসভঙ্গ' করা না কী যেন হত। তাই না?

হঠাৎ চিরবিরোধী দুই শিবির যেন এক হয়ে গিয়ে একতার সুরে কথা বলে আজকাল।

হঠাৎ দুটো টিন এজার কৌতুকপ্রিয় এবং 'আমি একজন' ভাবের দুষ্টুমি আর নায়েকি করা ছেলেমেয়ের মনের এই পালাবদলটার মধ্যে সূক্ষ্ম ভাবে কোনও অদৃশ্য শক্তি কাজ করতে বসেছে না কি? তাই দুই বিরোধীপক্ষ একযোগে একদল মার্কা হয়ে ভোটে নামতে আসে?

* * *

দাদু! তোমাদের এই কাজটার কোনও মানে হয়?

আরে বাস্। ছুটির সক্কালবেলা হঠাৎ এমন যুদ্ধসাজ? কোন কাজটা দাদুভাই?

ওই যে তোমার প্রাণকেষ্টর টাকাটা লকারে পুরে রেখে দেওয়া! ও আর আসবে?

যদি আসে?

আসে তো বড় বয়েই গেল! ··আলো বলে ওঠে. ও কি বলে গিয়েছিল 'বাবু গো এতে আমার অনেক টাকা রইল, যত্ন করে তুলে রাখুন। কাল এসে নেব।' ওতো বলেছিল, যেখানে ইচ্ছে ফেলে রাখুন। ঘুঁটে কয়লার ঘরে। তো এসে চাইলে বলবে এতোদিন পরে এলে কেন? তোমার সে পুঁটুলি ইঁদুরে কেটে শেষ করে ফেলেছে।

সঙ্গে সঙ্গে হাসে হি হি করে, নেহাৎ মিথ্যে কথাও হবে না। আর কিছুদিন থাকলে তো শেষই করত দাদু!

তো করেনি যখন—

তাহলে বসে বসে শুধু 'প্রাণকেষ্ট প্রাণকেষ্ট' জপ চালিয়ে যাবে?

তাছাড়া?

আকাশ জোর দিয়ে বলে, অন্য বুদ্ধি তো করা যেত। আমি হলে তাই করতাম

কী সেই বুদ্ধিটা ?

কেন, টাকাগুলো ব্যাঙ্কের লকারে না রেখে ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে রাখলে সুদেটুদেও তো অনেক বেড়ে যেত। সেইগুলোও তাকে দিয়ে দিতে তখন। রোজ কাগজে দেখ না, কী সব 'বিকাশ টিকাশ' তাতে যত টাকা রাখবে, পাঁচ না ছয় বছরে যেন ডবল হয়ে যায়।

আরে সাবাস! এত খবর রাখ তুমি মাস্টার ?

হঠাৎ রঙ্গমঞ্চে দাদুর অর্ধাঙ্গিনীর প্রবেশ ঘটে, তা রাখবে না কেন ? ওরা সব এযুগের ছেলেমেয়ে! সবদিকে নজর। সবদিকে মাথা। তোমাদের মতন নয়। জীবনভর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে, শেষমেশ প্রাপ্তিটি কী ? না শুধু একখানা 'মাথাগোঁজার ঠাঁই'। লোকে কতদিকে কত মাথা খেলায়।

অথচ এই সর্বাণীই বলেছিলেন, 'টাকা উঠলেই, একখানা বাড়ি করে ফেলতে হবে। কিন্তু তা বলে রাখছি। তোমাদের তো তিন পুরুষ ভাড়াবাড়িতে। নিজেদের একখানা বাড়ি! ভাবলেও রোমাঞ্চ লাগে।'

আর মনের মতো বাড়িটি হওয়ায়, যেন স্বর্গের অধিশ্বরী হয়েছিলেন। এখন বললেন, লোকে চারদিকে কত মাথা খাটায়। আজকাল তো বাড়ি করলেই লোকে ফ্ল্যাটবাড়ির স্টাইলে বাড়ি করে যাতে, ভাড়াটে বসিয়ে আয় হয়।

মৃগাঙ্ক হেসে ফেলে বলেন, শোন রে আলো আকাশ, ভূতের মুখে রামনাম! বাড়িটা হবার পর কী বলেছিলে মনে নেই ?

সর্বাণী অগ্রাহ্যের সুরে বলেন, কত কথাই বলেছিলাম তার কোন কথাটা মনে রাখতে হবে সেটা শুনি ?

আহা, যে কথা হচ্ছে সেই কথাই। যখন বলেছিলাম, নীচের তলার ঘর তিনটে তো প্রায় পড়েই থাকবে, কে আর আমরা ওপরতলা নীচতলা করে শুতে আসব, আর তোমার সাজানো ড্রইংরুমে বসতে

আসব। তার থেকে আপাতত যদি নীচের তলাটা ভাড়া দেওয়া হয় —তো আমার সে প্রস্তাব কচুকাটা করে বলনি 'মরে গেলেও না। বাড়ি ভাড়া দেওয়া আর বিকিয়ে দেওয়ার মধ্যে তফাৎ কী? সাতজন্মে আর ওই নীচের তলাটা নিজের ভোগে লাগাতে পাবে? ভাড়াটে তো যাবৎ জীবেৎ থেকে যাবে। আর যদি নিজে বাড়ি করে উঠেও যায়, নিজের নামটি বজায় রেখে শালা সম্বন্ধী কাউকে বসিয়ে দিয়ে যাবে। আর না হয় তো ওঠাবার জন্যে মোটা টাকা খেসারত দিয়ে তবে বিদায় করা যাবে।' বলনি একথা? আহা তখন তো আর টেপরেকর্ডার ছিল না রে আকাশ, থাকলে তোর দিদার কথাগুলো টেপ করে রাখতাম।

সর্বাণী ব্যঙ্গের সুরে বলেন, যন্তরের অভাবে অসুবিধেটা কী হয়েছে তোমার? মনের মধ্যে তো একেবারে প্রতিটি কথা গেঁথে রেখে দেওয়া হয়েছে দেখছি। তো যা বলেছিলাম ভুল বলেছিলাম? হচ্ছে না এরকম? দেখছ না। আমি তো বলি বিকিয়ে দেওয়া কেন, বিলিয়ে দেওয়াই। বিকোলে তো তবু একসঙ্গে কিছু টাকা হাতে আসে, এ তো সে গুড়েও বালি। সেই মান্ধাতার আমলের ভাড়াটি কায়েম রেখে রামরাজত্ব করবে। তোমাদের কর্তাদের আইনে তো 'কারো সর্বনাশ, কারো পৌষমাস!' আমি তো ঠিক করে রেখেছি আকাশের বিয়ে হলে নাতি নাতবৌকে আমাদের ঘর দুটো ছেড়ে দিয়ে বুড়োবুড়ি দু'জনে নীচের তলায় গিয়ে বাসা বাঁধব।

উঃ! কী সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা দিদা! মার্ভেলাস!

কেন রে বাপু, কী এত দূর? দেখতে দেখতেই আট বছর কেটে যায়।

মৃগাঙ্ক বলে ওঠেন তবে আর আমাকে হ্যানস্থা করা হচ্ছে কেন? অ্যাঁ। লোকে কত মাথা খাটায় কতদিকে আয় করার চেষ্টা করে।' এই সব।

সর্বাণী সতেজে বলেন, তা 'যে কালে যে বিদ্যে!' এখন তো চারদিক দেখে শুনে মনে হচ্ছে ফ্ল্যাট প্যাটার্নে বাড়ি করাই বুদ্ধির কাজ।

ফ্ল্যাটের ভাড়াটেরা উঠে যেতে বললে উঠে যাবে?

তোমার যত এঁড়ে তর্ক। বসাবার আগে টাইম লিমিট করে লেখাপড়া করিয়ে নিতে হবে।

ওঃ লেখাপড়া। আইন। ওরে তোদের দিদা আইন আদালত সব জানে।

হেসে ওঠেন মৃগাঙ্ক, এ যুগে এখনও তোমার ওসবে বিশ্বাস আছে? তাহলে বলতেই হয় এ প্রশ্নের সতেজ উত্তর দেওয়া শক্ত। ওসবে আইন মানামানির প্রশ্ন আর এখন কই? 'লেখাপড়া?' হুঁ বয়ে গেল। মানলাম না। কী করতে পার কর। বড়জোর খারাপ ব্যবহার করতে পারবে। তো কর। সে অস্ত্র আমার হাতেও যে নেই তা তো নয়। তুমি কত খারাপ ব্যবহার করবে? আমি তার থেকেও খারাপ ব্যবহার করব, তুমি কত নীচ ইতর ছোটলোক হতে পারবে? আমি তার থেকেও নীচ ইতর ছোটলোক হতে পারব। তোমার স্টকে কত গালাগাল আছে? প্রয়োগ করে দেখ, আমার স্টক তার থেকে 'পুওর' কিনা। আসলে এতদিন পরস্পরের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত বাধেনি, তাই দু'পক্ষই মধু ঢেলে গলা জড়িয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু চাক তো মৌমাছিই বানায় না, ভিমরুলও বানায়!

আকাশ হঠাৎ রেগে উঠে বলে, তোমার এই এক স্বভাব দিদা। সকলের সব কথার মধ্যে এসে নাক-গলানো। হচ্ছিল দাদুর সঙ্গে আমার একটা কাজের কথা। আর তুমি অমনি এসে—

তো 'ক' বাবা। তোদের কাজের কথা। আমার বোধহয় ওদিকে তরকারি পুড়তে বসল।

চলে গেলেন সর্বাণী ত্বরিত পায়ে।

*　　　*　　　*

কাজের কথা? সে তো সেই ওই 'প্রাণকেষ্টর' টাকাটা যদি ডিম পাড়াবার জন্যে কোনও 'প্রকল্পে' ভরে দেওয়া যায়, তাহলেই তো ক'বছর পরে ডিম পেড়ে ডবল হয়ে যাবে। তখন যদি সেই প্রাণকেষ্ট

ভূত হয়ে এসে বলেই, 'দেঁ আঁমার টাঁকা দেঁ—' তো সেই মুফতে পাওয়া টাকাটাই হি হি তাকে দিয়ে দিয়ে চিন্তা। তবে বেচারি! তার মাথা খাটানো কাজে লাগে না। মৃগাঙ্ক বলেন, ওই 'বিকাশ প্রকাশ' যাতেই দিতে যাসরে ভাই, আগে তোকে জবাব দিতে হবে, হঠাৎ এতগুলো টাকা পেলে কোথায়?

কেন? কী জন্যে? যেখান থেকেই পাই না তাতে কার কী? বললে তো আইন টাইন এখন আর কেউ মানে না।

ওই তো মজা রে দাদু! মানে না, আবার মানেও।

'বোকারা এই রকম বলে—' অনায়াসে এই বাক্যটি উচ্চারণ করে বুদ্ধিমান আকাশ রাগ করেই গিয়ে পড়ার বই নিয়ে বসে।...পড়াশুনো যেন ইদানীং মাথায় উঠতে বসেছে। সেই বাহান্ন হাজার যেন বাহান্নটা ধারালো নখ হয়ে আঙুল দিয়ে বুদ্ধির ঘরটাকে খামচে ধরে বসে আছে।

কিন্তু একা আকাশ নামক অপরিণত বুদ্ধি ছেলেটারই কি? পরিণতির ঘরেও তো সেই নখের থাবার হানা।

তাই সকলেই যেন সর্বদা মনে মনে ভেঁজে চলেছে, 'আচ্ছা যদি এটা করা হয়।'

তো দেখা যায় সেটা ভোটে ফেললেই নাকচ। সেই 'সেটা'তে নাকি অনেক ফ্যাঁকড়া বেরোচ্ছে। অতএব, আবার মাথা ঘামানো।

চায়ের টেবিলে কথাটা পাড়ে করঙ্ক। যেন এমনি কথার কথা। কথাটাকে নিয়ে যে বিশেষ ভাব ভাবনা করেছে, এমন ভাব ফোটে না।

দেখ বাবা ভাবছিলাম তোমার 'প্রাণকেষ্টকে' ওভাবে লকারে ফেলে রাখা আর খাটের তলায় ফেলে রাখায় তো তফাত বিশেষ নেই, তার থেকে যদি—

এখন আর বাড়ির কেউ 'টাকাটা' বলে না। সকলেই তার উল্লেখ করতে হলে বলে, 'প্রাণকেষ্ট।' ভাবটা যেন কৌতুক করছি, একটা মজার কথা বলছি। 'টাকাটা নিয়ে চিন্তা করছি এমন ভাববার হেতু নেই। অতএব 'টাকা' নয় 'প্রাণকেষ্ট'।

করঙ্ক আর কিছু বলার আগে মৃগাঙ্ক হেসে বলে ওঠেন, একটু তফাত আছে অবশ্য। ওখানে অন্তত ইঁদুরে কুচোবার ভয় নেই।

করঙ্ক বলে ওঠে, ভরসাও খুব নেই। আজকাল তো ব্যাঙ্ক ডাকাতেরা ভল্টেও পর্যন্ত হানা দিচ্ছে শুনতে পাই। তো ব্যাঙ্ক তো সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়।

বাধ্য নয়?

বাঃ। কী করে? আমি কা রাখছি না রাখছি তা দেখিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে কোনও রিসিট নিয়ে তবে রাখা হয় কি? কেউ যদি একবাক্স পেতলের গহনা রেখে দিয়ে পরে বলে 'আমার একবাক্স সোনার গহনা ছিল।' কে দিতে যাবে ক্ষতিপূরণ?

করঙ্ক নিজে 'ব্যাঙ্কবাবু' সম্প্রতি একটা 'ব্রাঞ্চ ম্যানেজার' হয়েছে। তবে মৃগাঙ্কর 'লকার' তার ব্যাঙ্কে নয়। পাড়ায় অবস্থিত অন্য এক ব্যাঙ্কে। অনেক আগে ছেলের বিয়ের পরই তিনি এই লকারটি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। সুরভির গহনা টহনা এখানেই থাকে। শ্বশুর আর বৌয়ের নামে 'ভল্ট'। গহনা তো বৌয়েরই বেশি। সর্বাণীর আর পোশাকি গহনা কতই বা? তবে গোছানো মেয়ে বলে, সেই কোন-কালের আশীর্বাদী গহনা টহনা থেকে ছেলের অন্নপ্রাশনের যৌতুক ক্ষুদে গহনাগুলিও যত্নে রেখে দিয়েছেন। তো এতকাল ভাড়াবাড়িতে বাড়িতেই আলমারিতে থেকেছে। কারণ তখনও গোদরেজ-এর আলমারি সম্পর্কে একটা বিশ্বাস আর সমীহ ছিল শক্তভূমিতে। এ যুগের নয়া চেহারার ডাকাতদের কাছে না কি গোদরেজ মান হারাচ্ছে। অতএব নতুন বৌয়ের গহনার নিরাপত্তার কারণেই ওই 'ভল্ট'।

নিমন্ত্রণ বাড়ি যেতে গহনার দরকার পড়লেই শ্বশুর বৌ দুজনে খুব গল্প চলে। সদ্য পরিচিত জনেদের অনেকের ধারণা পিতা কন্যা। আজকাল তো, আর মেয়েদের মাথায় কাপড় দেওয়ার রেওয়াজ নেই। কাজেই তেমন ভাবাটা স্বাভাবিক। শুধুই তো শ্বশুর ঠাকুরের সামনে পুত্রবধূর স্বচ্ছন্দ ভাবটিই নয়, ভালবাসা ভব্যভাবটিও তো দেখতে পাওয়া যায়।

*   *   *

তাহলে ?

করঙ্কর আলোচনা অনুযায়ী ধরে নিতে হ'চ্ছে 'ভল্ট'ও নিখুঁত নিরাপদ নয়। 'তাই ভাবছিলাম—'

করঙ্ক যা ভেবেছে তার সারার্থ এই 'প্রাণকেষ্ট'কে যখন বাড়িয়ে তোলার কোনও সুবিধে দেখা যাচ্ছে না, তখন 'কমিয়ে ফেলার' চেষ্টা করাই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ। তাই—

একটু হেসে করঙ্ক বলে, অবশ্য 'বাহান্ন হাজার' ব্যাপারটা ভাবলে এমন কিছু না। বাড়ির সবাই। সে কাজে হাত লাগাতে এলে বাহান্ন সপ্তাহও লাগবে না তাকে ফিনিশ করতে। তবে সেটা তো সত্যিই প্রবলেম সলভ নয়—তাই—

হ্যাঁ তাই ভেবে ভেবে একটা পথ আবিষ্কার করেছে করঙ্ক, যে যদি ধর একটা নতুন বিমা করায়—মানে তার অফিসের মনোজ নামের ছেলেটাই ধরেছে বলেই এটা আরও মাথায় এসেছে করঙ্কর। মনোজ হঠাৎ পার্টটাইমের উপার্জন হিসেবে—সাদা বাংলায় একটা লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানির দালালি ধরেছে, এবং দালালের উপযুক্ত বাক্‌বিস্তারও বেশ রপ্ত করে ফেলেছে। অতএ করঙ্ককে 'নওয়াতে' চেষ্টা করছে। ধরুন মৌলিকদা মেয়ের বিয়ে-টিয়েও তো দিতে হবে ? সেই ভাবে একটা করে ফেলুন।' তো, ধর বাবা, যদি আমার মাইনে থেকে ওইটার 'প্রিমিয়াম' দিয়ে চলি, আর সেই মাপের টাকাটা, তোমার 'প্রাণকেষ্ট' থেকে খাবোল দিয়ে দিয়ে তুলে এনে সংসার খরচের কাজে লাগানো যায়, তাহলে সেই মাপের টাকাটা জমতে থাকে বরং বাড়তেও থাকে, অথচ সংসারেও অসুবিধে ঘটে না।

বেশ কিছুক্ষণ এ বিষয়ে আলোচনা হয় বাপ বেটার মধ্যে। মৃগাঙ্ক শেষমেশ বলেনও, তোমার এই বুদ্ধিটা অবশ্য মন্দ নয়। তোমার এখন যা মাইনে তা থেকে একটা নতুন বিমা করা বা মাসে শ'চার টাকা প্রিমিয়াম দেওয়া এমন কিছু সন্দেহজনক হবে না। তবে—মানে—ইয়ে কথা হচ্ছে, টাকাটা তো পরের।

করঙ্ক চট করে রেগে ওঠার ছেলে নয়, তাই ভিতরে রাগ এলেও বলে ওঠে না, 'তোমার কথাটা যেন হল বাবা—সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে, সীতা কার পিতা ?'

না তা বলে না, শুধু আস্তে বলে, সেটা তো অস্বীকার করছি না, তবে ওটা কারুর কাছ থেকে তো ছিনিয়ে আনা হয়নি। বরং ওটা আমাদের কাছে তো রীতিমত বিপদই হয়ে বসেছে। তাছাড়া বোঝাও তো যাচ্ছে টাকাটা লোকটার মাথার ঘাম পায়ে ফেলা নয়। আমি তো মনে করি না—ওতে ভয়ানক কিছু অন্যায় হবে।

মৃগাঙ্ক বলেন, তা হলে যা ভাল বুঝিস কর।

করঙ্ক সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, নাঃ। আমি যা ভাল বুঝি তাই করব, এ কথায় আমি রাজি নই বাবা। আমার কথা হচ্ছে তুমি যা ভাল বোঝ তবেই —'

তা এ ধরনের কথাই ওদের বাবা ছেলের মধ্যে হয় বটে। বাড়িতে রং করানো কি কোনও ব্যাপারে মিস্ত্রি লাগানো, অথবা—লোক লৌকিকতার ব্যাপারে 'ভাল দেখানো মন্দ দেখানো' নিয়ে একটা আলোচনা ওঠে, মৃগাঙ্ক বলেন, 'যা ভাল মনে হয় তাই কর।' এবং ছেলে সঙ্গে সঙ্গেই বলে, উঁহু। তোমার ঠিক কী ভাল মনে হচ্ছে সেটাই বল।'

তবে সেই আলোচনা আর মতামতের সমস্যা সমাধান যেন জলের আলপনার মতো, তখনি বাতাসে মিলিয়ে যায়। এবং অথচ দেখা যায়, নবীনের অভিমতেরই জয় হয়, প্রবীণের অকুণ্ঠ সমর্থনে। কিন্তু আজকেরই এই প্রসঙ্গে কি 'অকুণ্ঠ' সমর্থন দেখা যায় ? কোথায় যেন একটি দ্বিধা বিভক্ত চিন্তা। কাজেই আলপনাটাকে ঠিক জলের আলপনার পর্যায়ে ফেলা যায় না।

করঙ্ক মনের নিভৃতে ভাবে বাবার ওই দ্বিধাটি কি শুধুই সততার সেন্টিমেণ্ট ? না কি ওটা বেহাত হবার আশঙ্কা ?

আর মৃগাঙ্ক ভাবব না ভেবেও ভেবে ফেলেন, এই পরিকল্পনাটা

কি শুধুই বন্ধু মনোজের অনুরোধ উপরোধের ফলশ্রুতি? এর পিছনে অদৃশ্য আর কেউ নেই? কে জানে—করঙ্কর বৌ তার বাপের বাড়িতে ওই 'প্রাণকেষ্ট'র ইতিহাসটি ব্যক্ত করে বসেছে কিনা। এবং তারই ফলশ্রুতিতেই—

ওটা মনের নিভৃতে। তবে হঠাৎ শাঙ্কতকণ্ঠে বলে ওঠেন, তোমার অফিসের সেই দালাল বন্ধুটির কাছে এই গল্পটা করেছ নাকি?

কী মুস্কিল। পাগল নাকি?

তাহলে মানে সে কী করে জানল, একটা উটকো টাকা নিয়ে তোমার সংসারে একটা প্রবলেম চলছে।

মাই গড্। সে কথা উঠছে কেন? সে তার নিজের স্বার্থে বলেছে, এতটা ইনক্রিমেণ্ট হল মৌলিকদা সব খরচা করে ফেলছেন? আখেরটা চিন্তা করছেন না? এ তো ওর ব্যবসার বুলি।···আরও যা বলে, সে তো তোমরা শুনলে তাকে মারতে চাইবে।

· বলে হাসতে থাকে করঙ্ক।

আরও কী বলে আবার?

বলে? বলে ধরুন মৌলিকদা আপনি এই জোরদমে কাজ করছেন, হঠাৎ চেয়ারে বসে এলিয়ে পড়লেন। ব্যস হার্টটি জবাব দিয়ে বসল। তখনকার কথা ভেবে—

থাম বাবা। আচ্ছা বদ ছেলে তো?

বদ নয়।··· হাসে করঙ্ক, বেজায় ফাজিল।

তারপর কীভাবে যেন সেই ফাজিলের প্রসঙ্গটিই চলতে থাকে। যার মূলসূত্র, নিজেকে নিয়ে মজা করতে নিজের ঘরসংসারের কথা। অফিসে বলে বেড়ায়।

শ্রোতা বেড়ে যায়।

করঙ্ক হেসে হেসে বলে, বুঝলে মা? আমার অফিসের সেই মনোজ? যার কথা বলছিলাম সেদিন, তাদের পাশের ফ্ল্যাটের মহিলাটি কী ভাবে তার ছেলেটার দেখাশোনা করেন, মনোজের স্ত্রী 'মাসিমা' বলতে অজ্ঞান। তিনিও বোনঝি বলতে বিগলিত। ব্যস!

ঘটে গেছে তার সঙ্গে। মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

অ্যাঁ। সে কী রে? কেন?

'কেন' তা কে জানে। শুনলাম তো একদিন না কি মনোজের ছেলে বায়না করে তাঁর একটা সৌখীন টেবিল ল্যাম্পকে ফেলে ভেঙে দিয়েছিল বলে তিনি একটু বকেছিলেন, ব্যস। হয়ে গেল ছেলের মার অপমান। কথা বন্ধ মুখ দেখাদেখি বন্ধ। ছেলেটা 'মাসিদিদা, মাসিদিদা' বলে কেঁদে হাট বাধাতেই, তাকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। ঘরে আটকে রাখা হচ্ছে। এবং ছেলের ভার এখন নিজের মায়ের ওপর চাপাতে কাঠখড় পোড়াতে হচ্ছে। বাপের বাড়িটি নেহাত কাছে নয়। এখন নাকি বৌ ঠিক করেছে ছেলের স্কুল বদলে বাপের বাড়ির পাড়ার স্কুলে ভর্তি করে দেবে। ছেলে সত্যি দিদার কাছেই থাকবে।

সর্বাণী একটু হেসে বলেন, তা ঐ মেয়ের মায়ের সঙ্গে ঘটে যেতেই বা কতক্ষণ? বোঝাই তো যাচ্ছে ছেলেটি বেয়াড়া আবদেরে। তা সত্যি দিদাও তো সর্বংসহা নন?

করঙ্ক হাসে।

বলে তখন হয়তো 'আয়াদিদা' খুঁজতে হবে।

অপরের বাড়ির মজা নিয়ে গল্প করতে করতে তখনকার মতো বাতাস আবার হালকা হয়ে যায়। করঙ্ক বলে, মা আজ যা দিয়ে ভাত খেয়ে যাচ্ছি, ওই মনোজটা শুনলে পাগলা হয়ে যাবে। বেচারা। ভাবতেই পারে না অফিসবেলায় এই সাতরকম আইটেম।

সাত আবার কোথারে?

কেন? সাত নয়? গুণে যাও। এই এক, দুই, তিন—

থাম তো। ডাল আবার একটা 'আইটেম' নাকি। কথায় বলে ডালভাত। এরপর হয়তো লেবু কাঁচালঙ্কাও আইটেম গোনার সময় ধরতে বসবি।

* * *

হ্যাঁ। আপাতত আবার আকাশ নির্মল নীল। কিন্তু আবার

কোন ফাঁকে ঈশানকোণে মেঘ জমতে শুরু করে।

ওমা। তাই না কি? এই ব্যবস্থা করতে চাইছে কঙ্ক? এ বাপু তা ওর মাথা থেকে বেরিয়েছে বলে মনে হয় না।

আমারও মনে তাই হয়েছিল একবার।

মনে হবার কিছু নেই, এ অন্যের পরামর্শ। কঙ্ক আমার জীবনে কখনও প্যাঁচ পোঁচের ধার ধারে না! তুমি এককথায় রাজি হলে?

না মানে, ব্যাপারটা কী জান? ইয়ে—

থাক, আমাকে আর তোমার ব্যাপার বোঝাতে হবে না।

সর্বাণী চাবির গোছা বাঁধা ভারি আঁচলটাকে ঝনাৎ করে পিঠে ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলে ওঠেন মা ভাইদের কাছে সব বলা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তারাই এসব কূটকচালে পরামর্শ দিচ্ছে। কঙ্ক এত সব জানত কখন?

তা কূট কচালেই বলতে হয় বৈকি।

ব্যবস্থা এই—করঙ্ক মাসের গোড়াই মায়ের হাতে সংসার খরচ বাবদ যে টাকাটি ধরে দেয়, তা বেশ মোটা অঙ্কেরই দেয় অবশ্য, না হলে আর এত রামরাজত্ব খাওয়ামাখা হয়ে ওঠে? মৃগাঙ্কর পেন্সন থেকে বাড়ির ট্যাক্স, ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল, কি বাড়ি রক্ষা হিসেবে খুচখাচ মিস্ত্রি লাগানো, আর 'নিজস্ব' খরচ টরচই চলে, এবং সর্বাণীর পুজোপাঠ সামাজিক লোকলৌকিকতাগুলোই মাত্র হয়। কিন্তু 'সংসার' নামক বিরাট হাঁ করা দৈত্যটির হাঁ বোজানোর দায় মৃগাঙ্কর মোটা মাইনেওয়ালা ছেলেরই। তা সেটি তো, নেহাত রোগা নয়? এ তো আর সে যুগ নয়, যে যুগে বলা হত 'দুটো ডালভাতের আবার দাম কী?' তবু 'কাজের লোক' তো ঠিকেই। সে 'পোষ্যর' মধ্যে পড়ে না।

তত্রাচ খরচটি কম নয়। কারণ বাড়ির সকলেই ভোজনবিলাসী। আর সেই 'বিলাস ব্যবস্থাটি' রপ্ত করিয়েছেন সংসারবিলাসী সর্বাণী মৌলিক। রান্নাঘরে নিত্য আড়ম্বর তাঁর। কোনদিন দৈবাৎ অনাড়ম্বর ব্যবস্থা হলে মনে সুখ পান না। তো ছেলে বিনাবাক্যেই সেটা মেনে

নিয়ে উপার্জনের সিংহভাগই মার হাতে সঁপে দেয়। কিন্তু?

এখন এই কূটকচালে ব্যবস্থায় বলা হচ্ছে ছেলে নতুন একটা 'ইনসিওর' করাবে আর তার প্রিমিয়ম বাবদ, যেটা দিতে হবে, মাসে মাসে সেই মতো টাকাটা সে মাকে কম দেবে। সেই কমতি বা খামতিটি পূরণ করা হবে প্র'ণকেষ্টর অবদানে খাবোল দিয়ে দিয়ে।

প্রথমটা তো ব্যবস্থাটা সর্বাণীর মাথায় ঢুকতেই সময় লেগেছিল। তারপরই হঠাৎ কেমন গুম হয়ে গেলেন। মুখ দেখে মনে হতে পারে কে বুঝি তাঁকে বোকা পেয়ে ঠকাতে চেষ্টা করছে।

সেদিন সন্ধ্যায় পুজোর ঘরে অনেকটা সময় বেশি যায়। ছেলে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সাড়া পেয়েও তড়াক করে উঠে না পড়ে একটু গড়িমসি করলেন। অথচ ছেলের সঙ্গে এনিয়ে কোনও কথা বলাবলি করলেন না। অথচ এই ধৈর্যটি সর্বাণীর স্বভাববিরুদ্ধ।

অভিযোগজাতীয় কিছু করার থাকলে, দ্বিধা করেন না। যেমন এই কিছুদিন আগে টিভিটা একটু গড়বড় করছে বলে না কি তার মিস্ত্রিকে খবর দিয়েছিল করঙ্ক, মৃগাঙ্ক সে খবর না জেনেই তাকে ভাগিয়েছেন, 'না না ঠিক আছে তো। বেশ চলছে' বলে।

অতএব সর্বাণী তাঁকে তুলোধুনো করে ছাড়বেন এটা বিচিত্র নয়। ছাড়লেনও।

আবার ছেলেকেও সেই একদিন?

সেটা তুলোধোনা না হোক বকাবকি তো বটেই। দোষের মধ্যে ছেলে না কি বৌয়ের কোন মামাতো বোনের বিবাহ বার্ষিকীর নেমন্তন্নয় দমদমে যেতে রাজি হয়নি, বলেছে পাগল না কি? টাটকা বিয়ের নেমন্তন্ন হলে আলাদা কথা, এই পুনরাভিনয়ের দাবি হতে কে যাবে অতদূর?

তো বৌয়ের মুখে সেই বার্তাটি শুনে তিনি ছেলে বাড়ি ঢুকতেই ধেয়ে এসেছিলেন, 'হ্যাঁরে তুই নাকি বলেছিস নেমন্তন্ন যাবি না? কেন? অ্যাঁ? তুই না গেলে বৌমা বেচারার যাওয়া হবে? বোন আহ্লাদ করে বলেছে—ইত্যাদি প্রভৃতি এবং বকে বকে তাকে যাইয়ে ছেড়ে-

ছিলেন। এইসব দেখেদেখেই তো সর্বাণীর নাতি নাতনিরা তাদের বাপীকে বলে মায়ের খোকা।

কিন্তু সেটা তো সেই আগে। যখন 'প্রাণকেষ্ট' এ সংসারের প্রাণ-পাখিটার গলাটায় একটা মোচড় দিয়ে যায়নি।

অন্যদিন হলে, আগে হলে, করঙ্ক নিজেই ডাক পাড়ত 'কী মা, তুমি এখনও ধ্যানস্থ? 'সমাধি টমাধি' হয়ে যাওনি তো?

কিন্তু আজ শুধু সুরভিকে বলল, মাকে দেখছি না?

যদিও পুজোর ঘরের সেই ধূপসৌরভ জানান দিচ্ছিল মা পুজোর ঘরে। আজ খুব দেরি হচ্ছে দেখছি।

এরবেশি আর কিছু বলল না সুরভি। বলে ফেলল না, 'আজ সারাদিন মার যেন কীরকম থমথমে ভাব।'

আসলে ওই ভাবটার কারণটা সুরভির অনুমানের আওতায় আসেনি। অথচ 'কর্তার' সঙ্গে কিছু হয়েছে এমন তো মনে হচ্ছে না। তাই কেমন একটু গুটিয়ে রয়েছে সুরভি। কী জানি কোথায় কী হয়েছে। নিজ পদ্ধতিতে বলে উঠতে পারবে না, 'মা আজই আপনার পুজোয় এত দেরি। 'বুধ সন্ধ্যার গল্পর' সিরিয়ালটা মিস করলেন।'

সুরভি বুদ্ধিমতী!

পরিবেশ পরিস্থিতি পটভূমিকা সম্পর্কে তার জ্ঞান আছে।

তবে কি আর পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছেলের সঙ্গে কথা বললেন না সর্বাণী? হঠাৎ কী গরম পড়ে গেল! কতক্ষণ লোডশেডিং চলেছে, করঙ্কর অফিসেও লোডশেডিং হয় কিনা, এরকম সব কথা তো থাকেই।

তা তেমন কথা করঙ্করও কি নেই? কাজেই স্তব্ধতার ভয়ঙ্করতাটি দেখা দেয়নি।

*   *   *

রাত্রির নিভৃতে কথাটা পাড়লেন সর্বাণী!

হ্যাঁ গো তখন যা সব বললে, ঠিকমতো মাথায় ঢোকেনি, বল তো

একটু ভাল করে।

মৃগাঙ্ক অনিচ্ছুক ভাবে বলেন, ওই তো বললাম। 'ওইটাকে' যখন কোন কিছু করবার সুবিধে হচ্ছে না, তখন ওভাবে শুধু ফেলে না রেখে, অন্য কৌশলে—

সর্বাণী গম্ভীর হলেন।

কৌশল তা'তো বুঝতেই পারছি। তার মানে ওদের ভাঁড়ারেই টাকাটা জমতে থাকবে! এই তো?

'ওদের।'

হঠাৎ যেন একটা শক্ খেলেন মৃগাঙ্ক।

আগে কখনও সর্বাণীর মুখে এ ভাষা শুনেছেন? কণ্ঠে এই সুর!

আস্তে বললেন, 'ওদের' আর 'আমাদের।' যেখানেই থাকুক, থাকলে তো ওদেরই থাকবে!

থাম। আমাদের এক্ষুনিই কিছু আর সব পাট চুকিয়ে মালা জপতে বসার সময় আসেনি। অনেক ভবিষ্যৎ পড়ে আছে।

'নেই' এ কথাই বা বলেন কী করে মৃগাঙ্ক?

তবে মৃগাঙ্কেরও কি মনে এসব ঢেউ খেলছে না? এখনও তো তিনি ভেবে চলেছেন....ধর যদি লোকটা হঠাৎ এসে দাঁড়ায়! যদি তার জিনিসের দাবি করে?

অবশ্য তাকে ঝেড়ে জবাব দেবার' সপক্ষে অনেক যুক্তি আছে, দাবি করবার কোনও রাইট নেই তার, তবু? তবু মনে হচ্ছে, মহানুভবতা দেখাবার চান্সটা তার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে তাহলে—! নোটের বাণ্ডিলগুলো তাকে ধরে দিয়ে বলে ওঠা যাবে না তো, এই নিয়ে যাও তোমার ময়লা নোংরা এই জিনিসগুলো। অন্য কেউ হলে আর পেতে হত না তোমায়, আমরা বলেই তাই—

সত্যিই যে তেমন ঘটনা ঘটলে, 'এমনটি হত তা' নিশ্চয় করে বলা যায় না। বরং হত নাই বলা উচিত, তবু ভাবতে দোষ কী? তা ভাবতে গেলেই তো নিজেকে 'নিরুপায়ে'র ভূমিকায় দেখতে পাচ্ছেন।

তাছাড়া যখনই মনে হচ্ছে একটা ভিখিরির সঞ্চয় সেই তাড়াবাঁধা

ময়লা ময়লা নোটগুলো থেকে নিয়ে নিয়ে সংসারে খরচা করা হচ্ছে, নিজেদের কেমন ময়লা আর অপবিত্র অপবিত্র মনে হচ্ছে।

সর্বাণী তিক্ত গলায় বললেন, ওরা যদি নিজেদের কোলে ঝোল টানবার বুদ্ধিটি খাটায় আমরাই বা বোকা হয়ে থাকব কেন?

আবার সেই 'ওই' আর 'আমরা।' এত সহজে হঠাৎ কী করে এমন প্র্যাকটিক্যাল হয়ে উঠলেন সর্বাণী।

মৃগাঙ্ক হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এসব কথা আর ভাল লাগছে না।

'ভাল আমারই কি খুব লাগছে? তবে যেমন দেখবে, তেমন শিখতে হবে।...'

তারপর হঠাৎ পরম আক্ষেপের গলায় বলে উঠলেন, সেই হতভাগা মুখপোড়া লক্ষ্মীছাড়াটা আমার শান্তির সংসারে কী অশান্তি ঢুকিয়ে দিয়ে গেল গো!

অথচ এমন কথা মনে এল না শান্তিপ্রিয় সর্বাণীর শান্তি বজায় রাখাটা তো আমারই হাতে। আমি তো মনে করলেই পারি, সেই লক্ষ্মীছাড়াটার জিনিস আমার ছুঁয়েও কাজ নেই। ওর যা খুশি করুক গে। আমার কী এসে যাচ্ছে? ও তো আমার জিনিস নয়।

না তেমন কথাটি মনে করতে পারছেন না। বরং কেবলই মনে হচ্ছে 'ওরা' চালাকি খেলে আমাদের বোকা বানিয়ে অতখানিটি আত্মসাৎ করবার তাল করছে।

আশ্চর্য, এত সামান্য কালের মধ্যে একটা অনাবিল বাতাস বওয়া দরদালানের মাঝখানে একখানা পাঁচিল উঠে পড়ল কী করে? গাঁথনির জন্যে তেমন সময় লাগল কই? কিন্তু উঠল তো।

তা পাঁচিল, পাঁচিলের ধর্ম পালন করবেই। তাই বাতাস আটকায় গুমোট সৃষ্টি করে।

* * *

অতএব সেই আসামী 'ওরা'ও নিভৃত রজনীর নিশ্চিত অবকাশে একই প্রসঙ্গে সময়কে বাজে খরচ করে চলে।

একজন ক্ষুব্ধ গলায় বলে, আমার যে কী মুসকিল হল। মনোজ সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে কাগজপত্র ঠিক করে ফেললাম, অথচ মনে হচ্ছে এ ব্যবস্থায় যেন ওঁরা তেমন সন্তুষ্ট নয়। কীভাবে যে ম্যানেজ করা যাবে বুঝতে পারছি না।

অপরজন অভিমান ভরা ঔদাসীন্যের গলায় বলে, সন্তুষ্ট না হলেই বা কী করা যাবে? বাইরের লোকের কাছে তো আর অপদস্থ হওয়া যায় না। যা ব্যবস্থা করেছ, তাই করবে! সংসারটাকে একটু টেনে কষে ম্যানেজ করতে হবে।

সংসারকে টেনে কষে! তাহলেই হয়েছে। মাকে তো জান?

তা' জানি বৈকি। এতদিন এসেছি তোমাদের ঘরে জানব না? তবে এখন আবার দেখছি 'জানা'র অনেক বাকি ছিল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা!

একটু দীর্ঘশ্বাস!

এরকমটা কিন্তু ঠিক ধারণা ছিল না।

কোনও 'একটা ধারণাই' তো শেষ কথা নয়।

আবার একটু স্তব্ধতা।

এখন কেবলই মনে হয় সেদিনের সেই অদ্ভুত ঘটনাটা যদি না ঘটত! সেই রাহুর মতো লোকটা যদি না আসত! লোকটা প্রত্যক্ষ ভাবে কারো বুকে ছুরি না মারলেও যেন সংসারটার স্বস্তি শান্তির বুকে একখানা ছুরি বসিয়ে দিয়ে গেছে।

কী জানি! হয়তো আসলে ওই 'স্বস্তি শান্তি'টা একটা হাওয়া বেলুন ছিল মাত্র!

বেচারি করঙ্ক!

হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় ওর, সুরভি যেন ওর অচেনা হয়ে যাচ্ছে, নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

বড় অসহায় বোধ করে। এর থেকে যদি সুরভি ওপরওলাদের সমালোচনায় মুখর হত, সেটাও বুঝি ছিল ভাল। তাতে হয়তো খারাপ লাগত, নিজেকে অপদস্থ মনে হত, তবু বোধহয় স্বস্তি থাকত!

যার যা মনের মাপ, সে তো সেই মাপেই ভাবে।

* * *

মৃগাঙ্কও যেন ক্রমশ গুটিয়ে যাচ্ছেন।

আর হঠাৎ যেন তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাচ্ছেন। ডেকে হেঁকে কোনও কথাবার্তা আর বলতে দেখা যায় না তাঁকে। কারণ নিজেই তিনি খুব একটা গোলমেলে অবস্থার সৃষ্টি করে রেখে বসেছেন। করঙ্ক মাসের গোড়ায় মার হাতে তার দেয় টাকাটার থেকে পাঁচশো টাকা কম দিচ্ছে, এবং মৃদু কুণ্ঠিত গলায় বলছে', কিছু কম থাকল, বাবাকে বোল ওটা 'ভল্ট' থেকে এনে—' কিম্বা বলে, বাবা দেরি টেরি করছেন না তো? তোমায় না অসুবিধেয় পড়তে···

কুণ্ঠা আর অস্বস্তিতে প্রায়শই কথাটা পুরো শেষ করে উঠতে পারে না করঙ্ক। অথচ আগে? এই মাস পয়লার প্রথম ক্ষণটি বেশ একটি আহ্লাদের ক্ষণ ছিল তার। মাকে ডেকে বলত, 'কী মা, এখন একটু সময় হবে? না কী হাত জোড়া?' বলত 'ছুঁতে পারা যাবে তো? নাকি এখন্‌ তোমার বিশুদ্ধ ডিপার্টমেণ্ট?'

সর্বাণী এগিয়ে আসতেন, হয়ত আঁচলে ভিজে হাত মুছতে মুছতে হেসে বলতেন, 'হ্যাঁ মা সবসময় বিশুদ্ধ ডিপার্টমেণ্টে! পুজো তো করি জোর দশ পনেরো মিনিট অপবাদটির ঘটা খুব!'

তারপর 'মা লক্ষ্মীকে' হাস্যবদনে হাত পেতে নিতেন ছেলের হাত থেকে। অতঃপর ছেলের মাথায় একটু হাত রেখে আশীর্বাদ করতেন। হয়ত বলতেন, 'ঠাকুর তোর আরও বাড়বাড়ন্ত করুন!'···আর ছেলে সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠে হয়তো বলে উঠত, 'হ্যাঁ, যাতে আমাদের পেটের মধ্যে আরও দু-চার কিলো মাল চালান করবার রসদটি মজুত রাখতে পার।

সুন্দর একটু সময়। 'সময় কেন হারিয়ে যায়?

এখন?

এখন করঙ্ক মার সামনে টাকার বাণ্ডিলটা ফ্রিজের মাথায় কি খাবার টেবিলের ওপর কি বাসনের তাকেই রেখে দিয়ে বলে, এখানে রাখছি।

তুলো' ··· আর ওই 'বাবা' সম্পর্কে উক্তি বা প্রশ্নটি কয়ে। ··· ঠিকমত সময় এনে দিচ্ছেন তো?'

অথচ মৃগাঙ্ক?

দিচ্ছেন না সেটি। সর্বাণীকে বলছেন, চেষ্টা করে দেখো না যদি ওর মধ্যে কুলিয়ে চালিয়ে নিতে পার।'

সর্বাণী ক্রুদ্ধ মূর্তিতে বলেন, তা সেই ব্যবস্থাটির বা তাহলে কী হলো?

ইয়ে, মানে—দ্যাখ মনটা যেন কিছুতেই সায় দিতে চায় না। কেবলই মনে হয়—

'সে' এসে নেবে?

তা ঠিক নয়। তবে মানে—

থাক তোমায় আর মানে বোঝাতে হবে না। শেষপর্যন্ত যা বুঝছি, যারা চালাকিটা খেলল, তারাই গাছেরও খাবে, তলারও কুড়োবে। তুমিই তার সহায় হবে।

অথচ ছেলের কাছে লাগিয়েও তো দেন না, 'তোর বাবা প্রাণ ধরে তোর ব্যবস্থার ধার ধারতে পারছে না। এখনও প্রাণকেষ্টর পথ চেয়ে বসে আছে।'

দেন না। কে জানে কেন?

অতএব একটা গোঁজামিলের ব্যাপার চলছে।

কিন্তু কেনই বা সেটা চলতে দিচ্ছেন সর্বাণী? তা'হলে বলতে হয়, কারণটি গুহায় নিহিত। প্রথমটা ভাবতেন কর্তার মতলবটা কী? নিজেই যে টাকাটার সদগতির মানসে ছোটখাট ব্যবসা ফ্যাবসা করবার চেষ্টা করবেন, এমন মুরোদ নেই। তাহলে? চিরকেলে কুড়ে স্বভাবের বশেই ওই গয়ংগচ্ছ ভাব, নাকি মতলবটি হচ্ছে পড়ে থাক, শেষ পর্যন্ত ওই 'পুত্তুরটির' হাতেই থেকে যাক। নাঃ। সর্বাণী চিরটি কাল আরভ্যাবলা হয়ে থাকতে রাজি নয়, কেনই বা? সবাই যখন নিজের আখেরটি বুঝছে!···

অতএব মনে মনে একটি পরিকল্পনা করে চলেন।

জন্মজীবনে তো তীর্থধর্ম কিছুই করলাম না। ছেলেবুড়ো গিন্নি-বান্নিরা সবাই হরদম বেড়িয়ে পড়ে। কতরকম সব 'স্পেশাল' হয়েছে আজকাল। কুণ্ডু তো কতকাল আছে, এই তো গেল বছরই তো মানুমাসিরা 'কুণ্ডু স্পেশালে' সারা দক্ষিণ ভারত ঘুরে এল। তীর্থকে তীর্থ, বেড়ানো কে বেড়ানো, আমায় তো বলেছিল কতবার। বলেছিল আজন্ম সংসার সংসার' করেই মরলি, ছেলের বৌ তৈরি হয়ে উঠেছে, এখনও আঁকড়ে পড়ে থাকা! এবং মৃগাঙ্ক কোথাও যেতে চান না শুনে বলেছিলেন, তো 'জামাই' যদি ঘরকুনো হন, তাই বলে, তুইও বন্দি হয়ে থাকবি? চল না আমাদের সঙ্গে, কোনও অসুবিধা হবে না।

সর্বাণী অবশ্য তখন তাতে উৎসাহ পাননি। একা অন্যের সঙ্গে। কেমন যেন বেচারি বেচারি মনে হবে নিজেকে। পরের সঙ্গে গিয়ে আপন ইচ্ছেপ্রকাশ করতে, কেনাকাটা করতে সবসময়ই হয়ত কুণ্ঠিত ভাব আসবে। ··· সংসারের সবাই মিলে, অর্থাৎ ছেলে বৌ নাতিনাতনি নিয়ে একটু জমজমাটি ভ্রমণের ছবিই মনের মধ্যে পোষণ করতেন চিরকাল তা সে সুবিধে আর হল কই? ছেলে তো হঠাৎ হঠাৎ অফিসের দলে মিশে বার দুই সপরিবারে ঘুরে এসেছে দীঘা আর পুরী। অবশ্য তিনচার দিনের জন্য। সর্বাণীর অমন হোমিওপ্যাথি ডোজ এ রুচি নেই। যাবেন যদি তো ভালমতো সময় হাতে নিয়ে।

তা তেমন 'সময়' আসা তো সহজ নয়!

মৃগাঙ্করই না হয় এখন অফুরন্ত 'সময়,' ছেলের তো তা নয়, মাপা-জোপা ছুটি।

তো ছেলে অবশ্য বলেছে কতবার, 'বাবা আর তুমি তো কোথাও বেড়িয়ে আসতে পার মা। 'জন্মে কখনও তীর্থ করলাম না বলে দুঃখ কর—'

সর্বাণী হেসে ফেলে বলেছেন, এ বয়েসে 'তীর্থ' বলাটা শুনতে ভাল তাই বলি রে বাবা, আসলে বেড়াতে বেরিয়ে পড়তেই ইচ্ছে হয়। তা যে মানুষটির হাতে আমায় দিয়েছিলেন আমার বাবা, তাকে তো

দেখছিস? ঘরকুনোর রাজা। বেরোনোর কথা তুললেই একশো টালবাহানা।

করঙ্ক হেসে ফেলেছিল।

আহা। আমার বহু আগে স্বর্গীয় হয়ে যাওয়া বেচারা দাদা-মশাইটিকে তো এতদিন পরেও তাঁর কৃতকর্মের জন্যে গঞ্জনা খেতে হচ্ছে। তো বাবাকে একটু বল না—

বললেই যে শুনবে। সেই মানুষ।

ওই পর্যন্তই। আর এগোয়নি সে কথা।

আসলে নিজের দিকে থেকেও তেমন বেশি চাড়ও ছিল না। সাজানো সংসারটির ছন্দভঙ্গ করে 'শুধু দুজনে' বেরিয়ে পড়ার সম্পর্কে চিন্তায় প্রতিপদেই অসুবিধে বোধ করেছেন। 'ওই তো মানুষ, আমার 'সাধ বাসনা'র বিন্দুতে কান দেবে; তাছাড়া—নির্ঘাৎ 'খরচ খরচ' করে জ্বালাতন করবেন সর্বাণীকে। ছেলে বৌ সঙ্গে থাকলে বুকের বল।

হ্যাঁ এইভাবে তো ভাবতে অভ্যস্ত সর্বাণী। মুখে মৃগাঙ্কর দোষ দিলেও, নিজেও তেমন জোরজার করেননি কখনও। অথচ সর্বদা বলেও থাকেন, 'কখনও তীর্থধর্ম কিছু হল না।'

তো এখন হঠাৎ মনের হাওয়া অন্যমুখী বইতে শুরু করেছে। এখন মনে হচ্ছে এবার শুধু দু'জনে বেরিয়ে পড়ে ছাড়ব। আর মৃগাঙ্ক টাকার প্রশ্ন তুললেই, আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে ছাড়ব সত্যিই সর্বাণী ভ্যাবলা নয়।

এই রকম চিন্তাধারাটি যত এগোচ্ছে, ততই আর 'ছেলে বৌ সঙ্গে না থাকাটাকে সর্বাণী পৃষ্ঠবলহীনতা ভাবছেন না। বরং উল্টোমুখী হাওয়ার কারসাজিতে ভাবতে শুরু করছেন, সবাই মিলে বেরলে তো, সর্বদা ওদের কোনটি ভাল লাগছে না, কোনটি ভাল লাগবে, সেটাই দেখতে হবে। নিজে তো গৌণ হয়েই থাকতে হবে। তো একটাই সুবিধে। বয়স হয়েছে, কর্তা গিন্নি তীর্থ করতে বেরোবেন, এটা অন্যায় কিছু নেই স্বাভাবিকই।

'দেশবিদেশ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি, আলো আকাশ সঙ্গে থাকছে না—'

এটা ভেবে তেমন শূন্যতা বোধও আসছে না যেন। এ যেন সর্বাণীর কারো ওপর একটা 'চ্যালেঞ্জ'। অথচ পুরনো কালের ভাষায় বলা যায় 'প্রতিশোধ গ্রহণ স্পৃহা।'

তবে, যাব বললেই কি যাওয়া হয়? আসলে অনভ্যস্ত তো। দিন গড়িয়ে চলে।

* * *

খবরের কাগজ নিয়ে আজকাল কেবলই কী এত দেখো দিদা?

আলো এসে কাছে বসে। বলে কোথায় কী সিনেমা হচ্ছে দেখে আর কী হবে? টিভিতেই তো সর্বদা কতো কী দেখছ বাবা!

সর্বাণী তাকিয়ে দেখেন।

যদিও আলোর পরনে সেই খুকি খুকি জামা, যেটাকে ওরা যাই বলুক, সর্বাণী বলেন 'সেমিজ'। তো সেই সেমিজই হোক আর যাই পরে থাকুক মুখে চোখে তো ষোড়শী লাবণ্য দেখা দিয়েছে। অথচ কত ফ্রি এরা, এই এ যুগের মেয়েরা! এখনও নেহাত বালিকার মতো নেচেকুঁদে বেড়াচ্ছে। পাকাপাকা কথাটি কইছে বটে, তবু তার মধ্যে তো আর পরিণতির ছাপ নেই। দায়িত্ববোধের বালাই নেই। আহ্লাদেভাসা একটি বালিকা মাত্রই। অথচ সর্বাণী? এই বয়েসেই মাথার কাপড় টেনে শাশুড়ির মন জুগিয়ে সংসারের দায় বয়ে মরেছেন।

হঠাৎ যেন নতুন করে আপন জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসেব এসে যাচ্ছে সর্বাণীর। 'আমি' নামক বস্তুটাকে তো কোনদিন আমল দেননি সর্বাণী, সেটা তো অলক্ষিত জগতে অদৃশ্যই ছিল এতকাল। এখন যেন সেটা আস্তে আস্তে অবয়ব নিতে শুরু করছে।

নিজের জন্যে তো কখনও কিছু করলাম না। চিরকাল পরের সুখ সুবিধেই দেখে এলাম। লাভটা কী হল? আর কেউ আমার কথা ভাবল?

হঠাৎ দৃষ্টির বিকৃতি ঘটলে হয়তো এমনই হয়। কিম্বা কালো চশমা পরলে। তাই নাতনির কথার উত্তরে বলে ওঠেন, দিদাকে কেবল বসেবসে সিনেমা দেখতেই দেখিস, কেমন?

দেখি আর না দেখি, তুমি তো বাবা একটি সিনেমা পাগল।

তাতে তোদের সংসারে কোনও ক্রুটি ঘটাচ্ছি?

ও বাবা, দিদা আজ এত রেগে কাঁই কেন? দাদুর সঙ্গে ঝগড়া করে এলে বুঝি? হি হি!

তা তো বলবিই। দিদা তো একটা ঝগড়াটি পাড়াকুঁদুনি।

আরেব্বাস! টেম্পারের। পারা হি হি হি কোথায় উঠেছে আজ? হল কী?

আলোর হি হি শুনে আকাশও এসে জোটে। আলো বলে, এই ছাখ দাদা, দিদা আজ ফায়ার।

'শুধু আজ কেন, দিদা তো আজকাল সারাক্ষণ ফায়ার হয়েই থাকে।' বলে, মাটিতে পড়ে থাকা খবরের কাগজখানা হাতে তুলে নেয় আকাশ। · বয়ঃসন্ধির কারসাজিতে তার গলাটা কেমন ভাঙাভাঙা আর কর্কশ শোনায়। মনে হয় যেন কিছু কটু কথা বলল।

ওঃ সবসময় ফায়ার হয়ে থাকি?

তাই তো দেখি। হঠাৎ যেন বুড়িবুড় হয়ে যাচ্ছ।·· আরে এটা কী? এই লাল ডটপেন দাগটানা ব্যাপারটা?···'কুণ্ডু স্পেশাল 'ভারতযাত্রা' 'ট্র্যাভেলিং এজেন্সি—এ সবে দাগ দিয়ে রেখেছ যে? যেতে ইচ্ছে বুঝি?

তা হয়ই যদি। দিদার কোনও একটু ইচ্ছে হওয়াও বেআইমি?

বলেই বোধহয় সর্বাণীর প্রতিপক্ষদের সামনে হঠাৎ নিজেকে বড় 'ক্ষুদ্র' আর 'নিচ' মনে হয়, তাই সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, তোদের দাদু, সাত জন্মে আমায় কোথাও নিয়ে গেছে? আগে তো ছুটি দেখাতো— এই তো কতকাল রিটায়ার করে বাড়ি বসে আছে।

যথানিয়মে 'দাদু'কে কাঠগড়ায় দেখে ওরা একটু আশ্বস্ত হয়ে বলে, যাবে কী? যা কুঁড়ে। বেরোনো মানে হচ্ছে শুধু বাজার যাচ্ছে আর দোকান যাচ্ছে, এই করছে তাই করছে। ব্যস। আর নাহলে সবসময় খবরের কাগজ আর বই পড়া।

কথার মাঝখানে আলো একটু মুচকি হেসে বলে, তাছাড়া কিপটেও তো আছে একটু।

আকাশ অতএব উত্তেজিত, এই দাদুকে তুই কিপটে বললি? আড়ালে বসে নিন্দে হচ্ছে?

আলো তাড়াতাড়ি বলে, আহা। নিন্দে আবার কী? ঠাট্টা করছি তো!

হুঁ ঠাট্টা। তুমি যা একখানা 'ইয়ে' মেয়ে! ঠাট্টার নামে গাঁট্টাটি বসিয়ে দাও। দাদু রিটায়ারম্যান না? বেশি টাকা কোথায়? অ্যাঁ?

আলো ফস করে বলে ওঠে, টাকা পেলেও তো ফেলে রেখে পচায়। কেন বাবা, 'প্রাণকেষ্ট' থেকেই তো দিদাকে নিয়ে তীর্থ বেড়িয়ে আনতে পারে? শেষ পর্যন্ত তো টাকাগুলো পড়ে পড়ে পচেই যাবে। আমাদেরও কিছু করতে দিল না, নিজেও কিছু করবে না।

আলোর এই অভিযোগবাণীর মধ্যে হঠাৎ যেন আলোর আভাস পেয়ে যান সর্বাণী। বাঃ। বাতাসটি তো দেখছি হঠাৎ বেশ অনুকূল। বলে ওঠেন, পচানো বের করছি। এইবার দেখ না, ওই দিয়ে তোদের দিদা ড্যাং ড্যাং করে ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ছে।

দাদু প্রাণকেষ্টকে নিতে দিলে তো।

দেবে না বৈ কি। দেখিস।

ব্যস ওতেই বিনা ঘোষণাতেই বাড়িতে চাউর হয়ে গেল সর্বাণী 'ভারত ভ্রমণে' বেরোচ্ছেন। বিজলী পর্যন্ত আলো আকাশের আলোচনার একটুকরো শুনে বলে বসল কাছে এসে, 'মাসিমা নাকি তীর্থ যাচ্ছ?' কতদিনের জন্যে যাবে?

*　　　*　　　*

প্রথমটায় খুব রেগে উঠেছিলেন সর্বাণী, কারণ মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন সহজে কারুর কাছে ভাঙবেন না, তলে তলে সবদিকের সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলে তবে লোক সমাজে প্রকাশ করবেন। মুসাবিদাও করে রেখেছিলেন, যেন নেহাত অবহেলাভরেই বলে উঠবেন, কাগজে কতো কতো বিজ্ঞাপন দেখি, তীর্থ ভ্রমণ ট্রমণের কত ব্যবস্থা; আমি এবার ঠিক করেছি, 'কুণ্ডু স্পেশালে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ' করে আসব।

অতঃপর বাড়িতে যে যে ধরনের কথা হওয়া সম্ভব সেটা আন্দাজ করে করে তারও জবাব তৈরি করে রেখেছিলেন।

অবশ্য ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, মৃগাঙ্ককে দিয়ে চুপিচুপি সব কিছু 'পাকা' করে ফেলা সম্ভব কিনা। হয়তো বলে বসবেন, 'ওসব খোঁজখবর নেওয়া-টেওয়া করঙ্ককেই বল না।'...অথবা প্রথম নম্বরেই প্রস্তাবটাই নাকচ করে দেবেন। নাঃ। সহজে হবে না, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে সর্বাণীকে।

তো 'চুপিচুপির' পরিকল্পনাটি তো ভেস্তে বসল নাতি-নাতনির সঙ্গে শৌখিন কলহে। তার মানে নিজেই বজ্র আঁটুনির গেরোটি ফস্‌কা করে মরলেন। তবে এখন আবার মনে হচ্ছে এ একরকম মন্দের ভাল। শাপে বর। গৌরচন্দ্রিকার দায়টা আর পোহাতে হলো না।

বাদী ও প্রতিবাদী উভয়পক্ষের সংলাপগুলো একাই মনে মনে রিহার্সাল দিয়ে চলছিলেন সেগুলোর দরকার হল না।

মৃগাঙ্ক হঠাৎ এসে ঈষৎ উত্তেজিত গলায় বলে উঠলেন, কী সব বাজেবাজে কথা বলে বেড়াচ্ছ? তুমি নাকি কুণ্ডু স্পেশালে ভারত ভ্রমণে যাচ্ছ।

সর্বাণী স্থির গলায় বলেন, যচ্ছিই তো। একা আমি কেন? তুমিও। এই তো সামনের মাসের দশ তারিখ থেকেই বুকিং শুরু।

আমিও যাচ্ছি। চমৎকার। সবটাই ঠিক করে ফেলা হয়েছে?

সর্বাণী বলেন, ইচ্ছেটাকে ঠিক করে ফেলেছি বাকিটা তোমাকেই করতে হবে।

আমি? আমি জানি কোথায় কী? কোথায় এদের অফিস টফিস!

খবরের কাগজে রোজ বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। দেখে নিও। পড়তে তো জান।

না, রেগে উঠে কাজ পণ্ড করবেন না সর্বাণী, তাই উত্তরসমূহ ঠাণ্ডা স্বরে।

মৃগাঙ্ক ওদিকে সুবিধে করতে না পেরে বলে ওঠেন, সামনেই আকাশের হায়ার সেকেণ্ডারি, আর আমরা দু'জন নাচতে বেড়াতে বেরোব? যতসব অ্যাবসার্ড কথা।

'নাচতে নাচতে' যাব এমন কথা তো বলিনি। সহজ সভ্য মানুষরা যেভাবে যায়, সেইভাবেই যাব। আকাশের পরীক্ষা, তা আমাদের জন্যে কী আটকাবে? আমরা ওকে তালিম দেবার মাস্টার? গোঁফ গজিয়ে যাওয়া ছেলে তার নিজের মা-বাপ রয়েছে—

'নিজের মা বাবা রয়েছে!' তোমার আজকাল কথাবার্তার ধরন এমন হয়ে যাচ্ছে কেন বলোতো? আশ্চর্য।

আশ্চর্যের কিছু নেই। মানুষ ইট কাঠ নয়। চিরকাল একরকম থাকে না।

আজকাল ওইসব স্পেশাল ফেশালের চার্জ কত বেড়ে গেছে তা জান?

জানব না কেন? বিজ্ঞাপনেই লেখা রয়েছে। তিন সপ্তাহের যাত্রা, যাত্রী পিছু সাড়ে পাঁচ হাজার—

এমনভাবে বলছ যেন ওটা কিছুই নয়। ওছাড়াও আরও ঢের বাড়তি লাগবে তা জান? হঠাৎ অতটি আসবে কোথা থেকে?

আর পারা গেল না। ফেটে পড়লেন সর্বাণী, বলে উঠলেন, চিরদিন ওই 'খরচ' দেখিয়ে দেখিয়েই তো আমার হাত-পা বেঁধে রেখে এসেছ। আমি যে একটা মানুষ আমার যে কিছু সাধ আহ্লাদ আছে, তা কখনও ভেবেছ? সারা জীবনের সম্বল, রিটায়ারের সময় পাওয়া টাকা, তার সবটাই তো বাড়িতে ঢাললে—

এমনভাবে বলেন সর্বাণী, যেন সেই 'ঢালাটা'র সময় তাঁর কোনও আবেগ আগ্রহ উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল না। যেন তখন কেবলই বলেননি, বাড়ি একবার বৈ তো দুবার হবে না, 'একটু'র জন্যে—নীরেস করে কোর না বাবু। পরে না হয় শাকভাত খাওয়া হবে—তাও ভাল।' বলেছেন বৈকি এসব সর্বাণী তখন। তবে মানুষ সাধারণত বড় বিস্মৃতি পরায়ণ! অবশ্য সব সময় নয়। অন্তত মেয়েরা নয়।

অনেক দূরকালের তুচ্ছ স্মৃতিতেও সে আলোড়িত হতে পারে, সারা-জীবনের বঞ্চনা বেদনা আর জ্বালার কথা লাইন বাই লাইন মনে রাখতে পারে। যেটা বোধহয় পুরুষে পারে না। ভুলে যায়। তাই এখন মৃগাঙ্ক ওই বাড়ির প্রসঙ্গে সর্বাণীর তখনকার কথা তুলতে বসলেন না। ভুলে গেছেন, না বলে উঠতে পেরে উঠলেন না? কে জানে!

কী জানি কী! তবে তাঁর নীরব হয়ে তাকিয়ে থাকার মধ্যেই সর্বাণী কথার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন, আর আমি তোমার ওকথা শুনছি না। কেন? 'ভল্টে'র ওই টাকাগুলো কী 'যখ' দেবে বলে ভেবে রেখেছ?

ভল্টের।

মৃগাঙ্ক একবার সর্বাণীর উত্তেজিত মুখের দিকে তাকালেন, তারপর আরও গভীর স্বরে উচ্চারণ করলেন, সর্বাণী!

সর্বাণী!

কতদিন আগে এই নামে ডেকে উঠতেন মৃগাঙ্ক?

কতদিন আগে শেষ ডেকেছেন? সর্বাণী কি কেঁপে উঠলেন?

অবশ্যই একটু থমকে গেলেন সর্বাণী!

মৃগাঙ্ক আরও আস্তে বললেন, একটা রাস্তার ভিখিরির তিলে তিলে জমিয়ে রাখা টাকাটা নেবার জন্যে হাত বাড়াচ্ছি ভাবলেই নিজেকে যেন ভিখিরিরও অধম মনে হয় সর্বাণী!

সর্বাণীর পক্ষে অবশ্য এখন আর তর্ক করতে বসা সম্ভব হয় না। বলে ওঠা সম্ভব হয় না, ওটা 'ভিখিরির তিলে তিলে জমানো' টাকা মোটেই নয়, একটা বদলোকের চোরা কারবারের টাকা। পারলেন না, তাই তাঁর চোখ ফেটে বেরিয়ে এল, চিরকালীন রমণীর চিরন্তন রমণীয়ত্বের নির্যাসটুকু। বিধাতার দেওয়া সম্বল! নাকি মেয়ে জাতটাকে অপদস্থ করার তালে চতুর বিধাতার কলকৌশল। পুরুষের চোখ আর মেয়েদের চোখ কি ভিন্ন উপাদানে গড়া? অথবা চোখ নয় তার স্নায়ু শিরা?

কে জানে কী, তবে আপাতত সর্বাণী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে

রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, আমি আর সে কথা নতুন করে কী ভাবতে যাব? আমি তো চিরকালই ভিখিরির অধমই। জীবনভর শুধু দাস্যবৃত্তি করে চলেছি আর সকলের মন রেখে চলেছি—

কথা পুরো শেষ না করেই উঠে গেলেন।

অথচ জীবনভর সত্যিই কি এমন কথা ভেবে এসেছেন সর্বাণী?

বধূবেলায় যখন ভয়ে ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকতেন, তখন জানতেন, এটাই রীতি, এটাই নিয়ম। অন্য ভাবনা আসেনি। তো সে জীবনটি তো দীর্ঘদিন বহন করতে হয়নি! পরবর্তীকালে তো বেশ আহ্লাদ আর দাপটের সঙ্গেই সংসার করে আসছেন। কোনদিন কি নিজেকে 'ভিখিরিতুল্য' মনে হয়েছে তাঁর? অথচ এখন হল!

সংসারে একটা শকুনের ছায়া এসে পড়েই কি সবকিছু অন্ধকার করে ফেলতে বসেছে?

তখনকার মতো তো কথা শেষ না করে উঠে গেলেন সর্বাণী। কিন্তু কথাটা কি আবার না উঠে ছাড়ল? একবার যখন চাউর হয়ে বসেছে। ···ছড়িয়ে পড়েছে আলোয় আর আকাশে! অতএব উঠল সে কথা। এবং বেশ জম্পেস চালে। করঙ্ক যখন অফিস থেকে ফিরে চায়ের টেবিলে বসেছে। এ সময় তো সকলেই ধারে কাছে।

সর্বাণীর এটা সন্ধ্যাপুজো অন্তে আর এক প্রস্থ চায়ের সময়।

সংসারের ছন্দটা কি আর সত্যি ভেঙে গেছে? তা বলা যায় না। মোটামুটি সবসময় সবই হয়ে চলেছে, শুধু যেন অকারণ কথার ঝুল-ঝুরিটা কমে গেছে বেশ কিছু।

তবু আজ সুরভি, শাশুড়ির হাতে চায়ের কাপটি ধরিয়ে দিয়ে মৃগাঙ্কর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, আচ্ছা বাবা, এটা আপনার অন্যায় নয়?

মৃগাঙ্ক একটু হাসলেন, অন্যায়ের তালিকা তো লম্বা গো মা, এটা কোনটা?

সুরভিও একটু হাসল, বরাবরের অভ্যাসের ধারায় ফিরে আসার ভঙ্গিতে বলল, এটা নতুন সংযোজন। আচ্ছা, মার এত ইচ্ছে হয়েছে

একবার বেড়াতে বেরোবার, আর আপনি উড়িয়ে দিচ্ছেন শুনছি।

এটি আবার কোথায় শুনলে? অ্যাঁ।

কোথায় আবার? আপনার প্রচার সচিবের কাছ থেকেই। তো কেন বলুন তো? কখনও তো কোথাও বেরনো হয় না—

এটি অবশ্যই সর্বাণীর অনুকূলে কথা! সহানুভূতিরই কথা। কিন্তু সর্বাণীর হঠাৎ কেন গা জ্বালা করে উঠল? ভিতরে ভিতরে কেন একটা অপমান অপমান দাহ অনুভব করলেন? আগে তো কিছুদিন আগেও এভাবেই কথা বলেছে সুরভি, আচ্ছা বাবা, মা নাকি কখনও বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখেননি। কী কাণ্ড বলুন তো? এ কিন্তু বাবা আপনার খুব অন্যায়। ·· বাবা! মার নাকি বরাবর খুব ইচ্ছে করে একবার যাত্রা দেখতে। তো আমাদের তো ওতে তেমন ইয়ে নেই, আপনি একবার মাকে নিয়ে দেখিয়ে আনুন না, ওই যে কী একটা পালা খুব নাম করেছে। বাবা, আজ কিন্তু মাকে নিয়ে একবার মার সেই কে একজন সমবয়সী মাসি আছেন, তার বাড়িতে বেড়িয়ে আসুন। তিনি সেদিন টেলিফোনে বলছিলেন, আমি তো কতবারই গেছি, তোমার শাশুড়ি সাতজন্মেও আসে? আর যাচ্ছি না।

হ্যাঁ এমন কত কথাই তো বলেছে সুরভি! যদিও সর্বাণীর বরাবরের ধারণা বৌটি শ্বশুরের বেশি সুয়ো, তবু দৃশ্যতে, তো সে শাশুড়ির হয়ে ওকালতিই করে থাকে শ্বশুরের কাছে। ···কই কখনও তো এমন দাহ ভাব আসেনি। বরং বলেছেন, 'থাক বৌমা, আর ধরে ভদ্দর ঘটাবার চেষ্টায় কাজ নেই। ওই মানুষের সঙ্গে একা বেরনো মানেই তো সারাক্ষণ টিক টিক! আর সারাক্ষণ তাড়া দেওয়া। ছাড় ওনার কথা!

কিন্তু আজ ওই সহানুভূতির সুরটা যেন দাহকরী! সুরভি তখনও বলে চলেছে, ওই স্পেশাল টেশালে গেলে তো কোন ঝক্কিই পোহাতে হয় না। বাবা! এবারে মনের জোর করে বেরিয়ে পড়ুন তো।

মৃগাঙ্ক আবার সেই বাতিল হয়ে যাওয়া খোঁড়া যুক্তিটাই কাজে লাগাতে চেষ্টা করে সেই আকাশের হায়ার সেকেণ্ডারি!

সুরভিও সেটা সর্বাণীর মতোই নস্যাৎ করে দেয়, তাতে কী? দাদু-

দিদার জন্যে মন কেমন করে রেজাল্ট খারাপ করবে? তাহলে তো আপনাদের কখনও বেরনোই হয় না। পরীক্ষা তো সারা বছর। ওরটা হল তো আলোর। না না ও ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে।

সর্বাণী আর একটু বিরস হলেন। ভাবলেন, বৌটির কথাবার্তা শুনে তো মনে হচ্ছে, আমাদের জন্যে যে সংসারে কিছুই আটকাবে না, সেটাই বুঝিয়ে দেওয়া।

করঙ্ক অবশ্য একবার স্তিমিত গলায় বলল, বাবা অবশ্য খুব ভুল বলেননি, ওর পরীক্ষা টরীক্ষার সময় তো তোমাকেও ওর বিষয় অনেক বেশি দেখতে হবে। মা না থাকলে—

বেশি কিছু বলতে পেরে ওঠে না। আজকাল কথা বলার সময় অলক্ষে একবার মায়ের মুখের দিকে আর একবার বৌয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে, প্রসঙ্গটা ঠিক খাতে প্রবাহিত হচ্ছে তো? ···হঠাৎ ফস্ করে একটা বেমক্কা বাঁক নিয়ে বসবে না তো?

তাই 'মা না থাকলে অসুবিধে' এটি উচ্চারণ করা সঠিক হবে কি হবে না বুঝতে না পেরে সে কথায় ঢ্যারা টেনে বলে, ঠিক আছে, আমি খোঁজখবর নিয়ে দেখতে পারি কবে বুকিং-এর শেষদিন। তরে পুজোর ছুটির সময় মানে অক্টোবর নভেম্বর মতো সময়েই হচ্ছে বেড়াতে বেরনোর পক্ষে আইডিয়াল ওয়েদার।

সুরভি বলে ওঠে, তোমাদের ওই আইডিয়ালের প্রত্যাশায় থাকলে, আবার কোনদিক থেকে কী অসুবিধে এসে হয়তো ব্যাপারটা গড়িয়ে যাবে।

কবঙ্ক বলে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, দেখছি।

সর্বাণীর মনের ভুরুটা কুঁচকে যায়। ওঃ, মনে হচ্ছে কর্তা-গিন্নি পরিকল্পনা করেই প্রসঙ্গটি ফেঁদেছেন। আমার জন্যে আর নয়, নিজেদেরই দুদিন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বাঁচতে ইচ্ছে। তা এই হিমালয় পর্বত দুটি বাড়ি ছাড়া হলে, গায়ে তো হাওয়া লাগবেই। যা ইচ্ছে করার সুখটি মিলবে। আমরা অবিশ্যি কোনও কিছুতেই বাধা দিই না, তবু গুরুজনদের উপস্থিতিই অবাধ স্বাধীনতার হন্তারক। ···হঠাৎ

মনে হয়, তো ফিরে এসে আবার ঠিক নিজে ভূমিকাটি ফিরে পেলে হয়। কে বলতে পারে 'চেয়ার পার্সনের' চেয়ারটি বেদখল হয়ে বসবে কিনা। বৌটি তো মনে হচ্ছে একেবারে আলগোছ হয়ে রয়েছেন।

তা এইটাই হয়তো স্বাভাবিক। দিঘিতে পুকুরে কাচের মতো জলের নিচেও জমানো থাকে কাদামাটি বালি, দৈবাত সেই জল ঘুলিয়ে তুললেই নিচে থেকে উঠে আসে তারা পুরো জলটাকে ঘোলা করে বসে।

সেই ঘোলা জলের মধ্যে ভেসে বেড়ানো কাদামাটির মতো এই কুটিল চিন্তাটির মুহূর্তেই মৃগাঙ্ক বলে উঠলেন, সেই ভাল, এই অক্টোবর নভেম্বরেই ঠিক করা যাবে। (আপাতত তো পিছনো গেল) ওদের তো সারা বছরই ট্রিপ—ছুটির সময় তো আরোই—

আহা তখনও তো আবার—

হনুমানের ল্যাজের আগুনে লঙ্কাদহন!

আলো বলে ওঠে, তখনও তো আবার যাওয়া যায় দাদু, তোমার তো বাপির মতো ছুটির ভাবনা নেই। দু'বার গেলেই বা কী? গাদা খানিক টাকা যখন পড়ে পড়ে পচছে!

সর্বাণী আবার একটা দাহর শিকার হলেন। ওঃ, সর্বাণীর জন্যে কারোরই কিছু এসে যায় না। বরং যেন তাঁর অনুপস্থিতিটাই কাম্য। তার মানে তলে তলে মা-বাপ ছেলেমেয়ে একসুতোয় গাঁথা হয়ে গেছে। অথচ চিরদিন সর্বাণী ওদের জন্যে প্রাণ ঢেলে এলেন। ...প্রায় চোখে জল এসে যায়। আকাশ তো একবার বলে উঠল না, সেই ভাল বাবা। তখন আমার পরীক্ষা মিটে যাবে। পরীক্ষার সময় তোমরা বাড়ি থাক বাবা। ...তা নয় দু'বার যাও না। তাতেই বা কী এসে যাচ্ছে। ...তার মানে জীবনভর ভস্মে ঘি ঢেলে এলেন সর্বাণী। একগাছের ছাল অন্য গাছে জোড়া লাগে না।

এই যখন পরিস্থিতি, তখন বিশ্বাস কী? হয়তো ওই ক'দিনের অনুপস্থিতিতেই অপ্রয়োজনীয় বুড়োবুড়ি দুটো কেন্দ্রচ্যুত হয়ে বসবে! হারানো চেয়ার ফিরে পাওয়া যাবে কিনা কে জানে।

নাঃ। এখন থাক।

সর্বাণী অতএব লাঠি আস্ত রেখেই সাপ মারেন। জোর গলায় বলে ওঠেন, পচুক। তোদের দাছু তাতে যথ দিক গে! 'দিদা' কোনও চুলোতেই যেতে চায় না। গেলে একেবারে সেই 'সেখানে' যাবে, যেখানে যেতে পয়সা খরচ করে টিকিট কাটতে হয় না। আর হতমান্য হয়ে ফিরে আসতে হয় না।

* * *

অকারণ পুলকে আলো ঝলসানো দিনগুলো ক্রমশ ইতিহাস হয়ে চলেছে। হয়তো বাইরের কেউ এলে টেলে, তখনকার মতো তাদের সামনে পুরনো ঠাট বজায় রাখার চেষ্টা থাকে, সেটার নিষ্প্রাণতা ধরা পড়তে দেরি হয় না।

সুরভির ভাইয়েরা অনেক দিন না এলে, মৃগাঙ্ক বলে ওঠেন না, 'বৌমা, তোমার ভাইদের তো অনেকদিন দেখি না। ডাক না একদিন! ইচ্ছে করে বলেন না তা হয়তো নয়, খেয়ালই থাকে না বোধহয়।

তা দেখা গেল মৃগাঙ্ক না বলতেই একদিন ডাকা হয়েছে দুইভাইকে। তা সুরভিকেও তো বাইরের ঠাট বজায় রাখতে হবে। প্রায় প্রায় যাদের খেতে বলা হত তাদেরকে হঠাৎ একেবাবে ভুলে গেলে, তারা কী মনে করবে? …বাড়ির লোকের ওপর অভিমান করে বাইরে খেলো হওয়া যায় না।

বাঙালি ঘরের গেরস্থালি মেয়েদের জীবনে তো এই এক জাঁতাকল। দীর্ঘদিনের অভ্যাসে আপন জন্মগৃহটাই হয়ে ওঠে, 'কুটুমবাড়ি তুল্য'। তাদের কাছে 'মুখরাখার' প্রশ্ন থাকে।

কিন্তু ঘটনাটা ঘটাতে কি বেশ স্বস্তি পেল বেচারি সুরভি?

টেলিফোনে বলে নেওয়া যেতো, কিন্তু বেশ কিছুকাল সে 'কাটা সৈনিকের' ভূমিকায় পড়ে আছে। …কাজেই করঙ্ককে বলল, অফিস ফেরত একবাব ঘুরে আসতে পারবে না? তাহলে সামনের এই 'ইদের' ছুটিটায় একটু আসতে বলে দেবে।

করঙ্ক ঈষৎ শঙ্কিত হয়ে বলে, মা বাবাকে না বলে?

ওরা আসতে পারবে না পারবে, আগে থেকে বলে কী লাভ?

আহা পারবে না কেন?

কেন, কোনও কাজ থাকতে পারে না? আসবে জানলে, তখন বললেই হবে।

করঙ্ক ইতস্তত করে বলে, সেটা কি ঠিক হবে?

সুরভি গম্ভীরভাবে বলে, তাহলে যেটা ঠিক হয় সেটাই কর। অফিসে বেরোবার সময় ওনাদের জিগ্যেস করে যেও।

আমি? আমি আবার কী জিগ্যেস করব?

তা তুমিই তো বলছ ওটা দরকার।

সে আলাদা কথা। যা বলবার তুমিই একটু সময় বুঝে গুছিয়ে—

তা এটাই তো পদ্ধতি ছিল এযাবত। এরা যা কিছু করবে ঠিক করে, সেটা ওপরওলাদের কাছে পেশ করবার ভার সুরভিরই ওপর। যেমন সেবার করঙ্কর অফিস থেকে একটা দল লঞ্চে করে সুন্দরবন বেড়াতে যাচ্ছে এবং তাতে করঙ্ককে 'সস্ত্রীক' বাবদ চাঁদা দিতে হয়েছে জেনে সুরভি বলল, তো চাঁদা দিলে আর যাবে না, ঠিক আছে, আমি ওঁদের মুড বুঝে ম্যানেজ করে নেব!

দুজনের কাছে দু-রকম ম্যানেজ।

মৃগাঙ্কর প্রায় 'জলাতঙ্ক' রোগ। লঞ্চ শুনলে আর সুন্দরবন শুনলেই নির্ঘাৎ 'হাঁ হাঁ' করে উঠবেন, যার নাম 'না না'। অতএব সেই 'না' কে সত্যি 'হ্যাঁ' তে এনে ফেলা। আর সর্বাণীর? তিনি হয়তো বলে বসবেন, 'একপাল পুরুষের সঙ্গে সারাদিন হুল্লোড়—'

আহা ওদের বৌয়েরাও তো যাচ্ছে।

তারা বোধহয় ধিঙ্গি অবতার। তোমার মতন সভ্যভব্য কি?

য্যাঃ। সে কী! সবাই আমাদের মতনই গেরস্থালি!

তাহলে যাবে যাও। সাবধান বাপু। তোমার শ্বশুরের তো আবার জলে ভয়।

তা বন্ধুদের সঙ্গে দীঘা যাওয়া পুরী যাওয়া এবং অফিসের কোনও ব্যাপারে কোনও ফাংশন হলে তাতে যাওয়া, এমনকি বাপের বাড়ির

দলে মিশে কোথাও যাওয়ার ব্যবস্থা হলেও—করঙ্ক ঝেড়ে জবাব দেয়, আমার দ্বারা হবে না, তুমি বলে টলে রেখ।

কিন্তু ওনারাই সত্যি খুব আপত্তি করেন, না অপছন্দ দেখান? তা তো মোটেই নয়। ওই 'সাবধান' শব্দটিকে নিয়ে যা কথা। সর্বাণী তো উৎসাহই দেন, এবং বৌয়ের সাজসজ্জাটি যাতে উচ্চমানের হয় তারজন্যে নির্বেদ প্রকাশ করেই থাকেন। সুরভিকে মোটামুটি 'সুন্দরী'ই বলা যায়, এবং সে সম্বন্ধে সর্বাণীর বেশ একটু গর্বই আছে বরাবর। তাই বলেন, 'এখনকার মেয়েরা সাজা নিয়ে কত মাথাই ঘামায়, পত্রিকাগুলো খুললেই তো কেবল রূপচর্চা! মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারাক্ষণ সেবা করে চলে। এতেও কি সময় আছে আজকাল মেয়েদের? তাই, কী করে নোখ সুন্দর করবে, কী করে চামড়া নরম রাখবে কী করে চোখের কোলে কাজল টানবে আর ভুরু নিয়ে কায়দা করবে, এই চিন্তায় মাথা ঘামাবে?' ·· তারপর আবার বলে ওঠেন, বৌমা আবার তেমনি, কিছুই করতে চায় না।

'চায় না' বলেও অবশ্য মনে মনে বেশ সন্তোষ বোধই করেন। তো সে যাক্ 'আপত্তি' শব্দটা কোন ব্যাপারেই ওঠে না, তবু যে কোনও ব্যাপারে ওনাদের জানানোর নীতিটি রাখে ছেলে বৌ। ঠিক যে জিজ্ঞেস করা তা নয়, শুধু একটু জানানো। গুরুজনের সম্মান সম্ভ্রমটি বজায় রাখা। এই আর কি। যাকে সৌজন্যও বলা যায়। এবং সেটি রাখার দায়টি চিরনিয়মে সুরভিরই। করঙ্ক বলে, 'ও তুমি বুঝে সুঝে ম্যানেজ কোর!'

সুরভি হেসে হেসে বলে, তোমার মা বাবা, আর ম্যানেজ করতে হবে আমাকে!

আজ সেই কথাটাই বলল সুরভি, কিন্তু হেসে হেসে নয়। গম্ভীর মুখে বলল।

তা' সংসার মঞ্চের হঠাৎ এই পট পরিবর্তনে সবথেকে অসহায় বেচারা করঙ্ক। তাকে রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে! সুখে পান্‌সি ভাসাবার আরামটি ঘুচেছে।

* * *

অফিস থেকে ফিরে করঙ্ক একেবারে ধসে বসে পড়ে।

কী ব্যাপার ?

একটা দারুণ মুশকিল ঘটে গেছে।

কেন ? আসবে না বিনু টুনু ? আমি তো বলেছিলাম।

না না, ঠিক উল্টো। তারা তো আসবেই তাদের বৌরাও আসবে। টুনুর বৌ আমায় দেখে একেবারে হৈ-চৈ। বলে 'কী জামাইবাবু যত আদর বড় কুটুম্বদের। আমরা বুঝি বানের জলে ভেসে এসেছি ? দেখুন আমরাও গিয়ে চড়াও হচ্ছি। প্রস্তুত থাকতে বলবেন দিদিকে।

সুরভি অবশ্য একটু শঙ্কিত হয়। মুখে যতই সাহস দেখাক, সর্বাণীকে না জানিয়ে কোন কিছু করার অভ্যাস তো নেই। তবে শঙ্কাটা তো প্রকাশ করা চলে না। আলগা ভাবে বলে, ছোট বৌটা বরাবরই ভারি আমুদে। তা' তুমি কি বললে ?

এক্ষেত্রে আর কী বলা যায় বল ? বললাম এর থেকে আনন্দের আর সৌভাগ্যের কী আছে ? নিশ্চয় চলে আসবে বেশ জমানো যাবে।

সুরভির মুখটা একটু আলো আলো দেখাল। ভাবছিল, করঙ্ক হয়তো বলে এসেছে, 'বাড়ি গিয়ে জানাব।' তা পারে। ওর সম্পর্কে তেমন আস্থা কই ? এখন বলল, তবু ভাল যে একটু মনিষ্যির মতো কথাটথা বলতে শিখেছ।

তার মানে আমাকে 'অমনিষ্যির' হিসেবেই রাখ।

এখনও পর্যন্ত তোমার ঠিক হিসেব করে উঠতে পারিনি।

তা না করে ওঠবারই কথা। এর খানিক পরেই তো বৌয়ের কাছে করুণ মিনতি, ব্যাপারটা মার কাছে বলার ভারটা আমার কেন ? আমি তো জানই বিশেষ গুছিয়ে কিছু বলতে পারি না। কথাই জোগায় না। প্লিজ তুমিই যেভাবে পার বুঝিয়ে বলে রেখ। আর কিছু নয়, যদি বলেন 'হঠাৎ কেন ?' মানে বিলু টুনুই তো আসে সব সময়। এবারে বৌ বাচ্চারা—

তোমার মা, তুমি তাঁর কাছে সহজ হতে পারবে না?

আরে বাবা, তুমিই তো সবসময়—মানে মার সঙ্গে তো তোমার ঠিক 'শাশুড়ি বৌ' ভাবটা নেই, 'মেয়ে মেয়ে' ভাবটাই তো—

মেয়ে মেয়ে ভাব? ঠিক আছে। তবে মেয়ে আর ছেলেয় তফাত কী?

ওরে বাবা। তর্কে তোমার সঙ্গে পারব? মোটকথা ও তুমিই ঠিকভাবে পারবে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য সুরভিকেই হাল ধরতে হল। তবে একটু গল্প বানাতে হল, না হলে সুবিধে হচ্ছিল না। গল্পটা এই, বাড়ির ফোনটা খারাপ হয়ে পড়ে থাকায় সুরভি করঙ্ককে বলেছিল একবার 'ও বাড়ির খবরটা নিতে, অনেকদিন খবর জানা নেই। তা' ফোন ধরেছিল নাকি টুনুর বৌ, তো ভীষণ আমুদে তো মেয়েটা, ফোন পেয়ে না কি হৈ-চৈ করে বলে উঠেছিল, 'আমরাও তো ভাবনায় ছিলাম কেবলই ফোন করি বেজে যায়, জানি না তো খারাপ। তো আমরা তাই ঠিক করে রেখেছি এই ইদের ছুটির দিনে সদলবলে আপনাদের ওখানে গিয়ে হাজির হব। মাসিমাকে বলে রাখবেন 'প্রস্তুত' থাকতে।

'মাসিমা'ই বলল। অবশ্য মনটা নরম হবে তাতে। তো কাজেই করঙ্ককে লজ্জায় পড়ে বলতে হয়েছে, ছুটির দিন যখন, তখন এখানেই একটু খাওয়া-দাওয়া হবে সকলে একসঙ্গে।

কিন্তু এত কিছুর কি সত্যিই দরকার ছিল? সর্বাণী কি এত অভদ্র যে বিরক্ত হবেন? তা হলেন না, কিন্তু বিরক্ত অথবা ক্রুদ্ধই হলেন, সুরভির পরবর্তী কথায়।

ছেলের হঠাৎ কর্তাত্বি করে শ্বশুরবাড়ির সগুষ্ঠিকে নেমন্তন্ন করে বসার মধ্যে গভীর কোনও কারণ খোঁজবার চেষ্টা করতেই সর্বাণী নিরুত্তাপ গলায় বলেন, তা এত ভাল কথাই। সত্যি আসেনি তো অনেকদিন। তো কী খাওয়াবে ভাই, ভাই-বৌ, ভাইপো-ভাইঝিদের সেটা ঠিক করে একটা ফর্দ লিখে শ্বশুরকে দাও—

সহজ সুরের মধ্যেও বাঁকা সুর একটা ধরা পড়ে বৈকি। আগে

হলে নিশ্চয় বলে উঠতেন, অ বৌমা, তাহলে ঠিক কর বাপু কী রান্না টান্না হবে। ওরা কী কী ভালবাসে—

এখন সুরভিকে প্রশ্ন 'কী খাওয়াবে তোমার আত্মীয়স্বজনকে—'

কিন্তু সুরভি যা বলে বসল, সেটা অপ্রত্যাশিত। সুরভির ভাইবৌরা ভাইপো-ভাইঝিরা নাকি 'বাইরে' খেতে ভীষণ ভালবাসে, দাদারাও কম যায় না, তাই সুরভি ভেবে ঠিক করেছে, কোনও ভাল জায়গা থেকে রান্না খাবার আনিয়ে ম্যানেজ করে ফেলবে।

বাইরে থেকে? হোটেল-রেস্টুরেন্টের?

না, ঠিক ওভাবে নয়, আজকাল অনেক ভাল ভাল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যারা অর্ডার দিলে অর্ডার মতো দশ বিশ জনের মতো বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়। সম্ভ্রান্ত জায়গা। অতএব নিমন্ত্রিতদেরও প্রিয় খাদ্য খাওয়ানো হতে পারবে, অথচ— বাড়িতে কোনও খাটুনি ঝঞ্ঝাট হবে না।

স্বভাবতই সর্বাণী এতে নিজেকে বেশ হতমান্য মনে করলেন। তার মানে, বৌ আর তাঁর ধার ধারতে চায় না, নিজের সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে, নাম কা ওয়াস্তে একবার শাশুড়িকে বলা। অতএব নীরস স্বরে বললেন, ব্যবস্থা যখন হয়েই গেছে তখন আর ভাবনা কী?

মৃগাঙ্ক শুনে ব্যস্ত হয়ে বললেন, সে কী? সে কী? কেনা খাবার খাওয়ানো হবে? কেন, বাড়িতে ওটুকু রাঁধার অসুবিধে কী বৌমা?

অসুবিধে আবার কী? বৌমার শাশুড়ি তো এক হাতে বিশ-পঁচিশ জনের রান্না করে ফেলতে পারেন, বাইরের খাবারের থেকে অনেক বেশি টেস্টফুল হয়, কিন্তু ওই ওরা মানে বৌরা ওই সব বাইরের খানাপিনার ভীষণ ভক্ত। চাইনিজ বলতে অজ্ঞান! কাজেই—

করঙ্ক আলগা হয়ে বেড়ায়। এ প্রসঙ্গটা নিয়ে কোনও কথাই বলে না। অথচ দেখা যায় যথাসময়ে লোকবাহিত হয়ে প্রচুর পরিমাণে সব এসে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে, প্রচুর কেন?

বাঃ। বাড়ির সবাই খাবে না? আবার রান্না করতে বসতে হবে নাকি? একমাত্র সর্বাণী যা ওসব অচ্ছুত বস্তু খান না, তা তাঁর একজনের

মতো একটু মাছের তরকারি আর ভাত করে নিলেই—

মৃগাঙ্ক একসময় সর্বাণীকে বলতে এলেন, তা একরকম মন্দ হচ্ছে না কী বল? তোমাদের আর খেটে পিটে সারা হতে হল না।

খাটতে কবে ভয় পেয়েছি?

না না তা নয়। তবে গল্পটল্প করবার সময় তো হয় না—? বরং তা এককাজ করতে পার। তোমার হাতের পায়েস ওদের খুব প্রিয়, তুমি না হয় জম্পেস করে একটু পায়েস—

সর্বাণীর ঝঙ্কারে কথা শেষ করতে পারেননি, থাম তো! ওইসব বাদশাহি খানার মধ্যে আমার পায়েস! ওকথা আর মুখে আনবে না।

সুরভি সকালের দিকে একটু চেষ্টা করেছিল, ওরা এসে পড়ার আগে সর্বাণীর জন্যেও ভালমন্দ একটু কিছু করে রাখতে, সর্বাণী একদম সে চেষ্টা বাতিল করে দিলেন। তাঁর জন্যে আবার হ্যাঙ্গামা করা। মাথা খারাপ। সে একটু সেদ্ধভাত করে নিলেই হবে।

একান্তই তুচ্ছ ঘরোয়া একটু ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানসিক দূরত্বটা যেন আরও বেড়ে চলে। কারণ এখন আর ঠিক পরামর্শ সাপেক্ষে কোনও কাজ না। একজন ভাবে—অকারণ কতকগুলি হ্যাঙ্গাম খাটুনি শোরগোল হৈ-চৈ (যেটা সর্বাণী কাজকর্ম হলেই করে থাকেন। বাজার অপছন্দ করে মৃগাঙ্ককে ধরে বকবক করেন, ছেলে আর কোন-দিন মানুষ হল না বলে শৌখিন আক্ষেপে বকবক করেন, 'কাজের লোকের' ত্রুটি নিয়ে বকবক করেন, এটাই তাঁর বিলাস। যেন নিজেকে বিকশিত করতে পারায় একটি মওকা পেয়ে তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করতে চান।) সেটা তো বাঁচল। আর অপরজন ভাবে এই পদ্ধতিতেই কর্তৃত্বভারটি নিজের হাতে নেওয়ার চেষ্টা।

সর্বাণীর ছেলেও যে এই সব ষড়যন্ত্রের শরিক হতে শিখছে, এটি বড় দাহকারক।

অহেতুক সন্দেহে ছোটখাট ঘাত-প্রতিঘাতে একবার ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা আর বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়ে বসলে, ক্রমশই তারা সেই শিকারকে গ্রাস করে বসে নিচের দিকে টেনে নিয়ে চলে, সংকীর্ণতার বিষবাষ্পে

বাতাসকে আচ্ছন্ন করে।

প্রবহমান স্রোতস্বিনীর নির্মল ধারায় স্বচ্ছন্দ গতি যদি হঠাৎ কোনখানে একটা নুড়ি পাথরে ঠেক খেয়ে স্বচ্ছন্দতা হারিয়ে বসে তাহলে সেই ধারা বাঁক খেয়ে খেয়ে আবর্তের সৃষ্টি করে। আর সেখানে জমে ওঠে শ্যাওলা, সেই শ্যাওলার গায়ে এসে এসে জমতে থাকে এটা ওটা আবর্জনা, অনেকখানি জায়গাকে করে তোলে পঙ্কিল। সেই পঙ্কিল শৈবালভূমি ক্রমশই পরিসর বাড়িয়ে চলে।

তবু বাইরে থেকে কি সহজে চট করে ধরা পড়ে? অন্তত যেখানে 'বুদ্ধির সম্বল' থাকে। আপাত দৃষ্টিতে সেদিনের সেই দুপুরে এই মৌলিক বাড়িটায় আমোদ আহ্লাদ হৈ-চৈ-এর কিছু ঘাটতি ঘটেছিল কি? যারা এসেছিল তারা তো আসর জমাবেই এপক্ষও পূর্ব আবহাওয়া বজায় রাখার চেষ্টা করল বৈকি! যে যার ভূমিকা যথাযথ পালন করল। তবে ওরা ফিরে যাবার সময় অলক্ষে একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে বলে গেল, 'মাসিমা মেসোমশাই হঠাৎ দেখছি একটু বুড়িয়ে গেছেন। সেই তরতাজা ভাবটা আর নেই।'

তা অস্বীকার করা যায় না। বুড়িয়ে যাবেনই।

শাস্ত্রবাক্যই তো বলেছে 'কুটিল সন্দেহ বিষ ক্রুর সর্পবিষতুল্য। সে নিজেকেই অবিরত ছোবল হেনে হেনে জীর্ণ করে ফেলে।'

শুধু জীর্ণই নয় ক্লেদাক্তও করে তোলে বৈকি। না হলে সর্বাণী একথা উচ্চারণ করে বসেন, 'তুমি একবার একদিন একলা চুপিচুপি ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখে এস তো—সেই বাণ্ডিলগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা। তুমি 'ভিখিরির টাকা' বলে হাত দিতে ঘেন্না পাও, ওদিকে তলে তলে ফর্সা হয়ে আসছে কিনা কে জানে! এত লটপটানির রসদ আসে কোথা থেকে? সেদিন মামাতো দাদার নাতির 'মুখে ভাতে' বালা দেওয়া হল, এদিন চার ডবল খরচ করে ওই রাজসূয়টি করা হল।

বললেন অবশ্য জগতের একমাত্র বিশ্বস্ত আর আপন জনের কাছেই, তবু মুখ দিয়ে বার করলেন তো? প্রমাণ দিলেন তো—তাঁর মনের

মধ্যে এই বালির ঢেউ পাক খাচ্ছে।

মৃগাঙ্ক অবাক হয়ে তাকিয়ে শুনলেন কথাটা, কথার মাঝখানে থামিয়ে দিলে আজকাল ভারি রেগে ওঠেন সর্বাণী তাই। কথাটা শেষ হলে তিক্ত গলায় বললেন, 'তলে তলে'টা পাচ্ছে কোথায়? আলাদা একলা যায় কোনদিন?

কিন্তু সর্বাণী কি যুক্তিতে হারবেন? বলবেন না, হ্যাঁ সঙ্গে অবশ্য যান মৃগাঙ্ক, কিন্তু তিনি কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে লক্ষ্য করেন বৌ কী বার করে নিল না নিল। ঝপ করে যদি দু-চারটে বাণ্ডিল ব্যাগে পুরে ফেলে ধরতে পারবেন মৃগাঙ্ক?

মৃগাঙ্ক দীর্ণ গলায় বলেন, তুমি ক্রমেই এত ছোট হয়ে যাচ্ছ কী করে ভেবে পাই না।

সর্বাণী বোধহয় এই প্রশ্নের আঘাতের লজ্জাটা ঢাকতেই বেজার গলায় বলেন, আমি তো চিরকালই ছোট, ছোটলোক। তোমার মতো মহৎ হতে আর পারলাম কই? তবে আর সবাই যে তোমার মতো মহৎ তা ভেব না। তুমি অপবিত্র টাকাটায় হাত দিচ্ছ না, আমায় জব্দ করে রেখেছ, ওদিকে ওরা ভাবতে পারে, 'মাসে মাসে তো নেওয়াই হচ্ছে, কমছেই তো। আর একটু কমলেই বা ধরছে কে? কী করব, আমার তো ক্ষমতা নেই, থাকলে চুপিচুপি গিয়ে দেখে আসতুম। কমে গেলে কে কাকে আসামী করতে যাবে? চাবি যখন তোমার কাছে।

মৃগাঙ্ক শান্ত গম্ভীর গলায় বলেন, দুটো চাবির একটা আমার কাছে আর একটা বৌমার কাছে।

তাই?

তাই তো।

চমৎকার। এরপর যদি সত্যিই কোনদিন তোমার প্রাণকেষ্ট এসে দাঁড়ায়? যারজন্যে প্রাণ ধরে ওতে নোখটি ডোবাতে পারছ না, তখন কী করবে?

মৃগাঙ্ক বলেন, আমার মাথাটা বড্ড ধরেছে, কথা কইতে ভাল লাগছে না। ঘুমোবার চেষ্টা করি।

পাশ ফিরে ঘুমোবার ভান করেন।

অতএব বুড়িয়ে যে যাচ্ছেন, সেটা প্রত্যক্ষ। মাথা ধরা শব্দটাকে মৃগাঙ্ক কবে কোনদিন কাজে লাগিয়েছেন?

আহত অপমানিত সর্বাণী অন্য অনেকদিনের মতো আজও ভাবলেন, এই দিব্যি গালছি, আর যদি ওই 'পাপ' নিয়ে কথা বলি।

কিন্তু 'পাপ' যদি মনের 'ভল্টে' শেকড় গজিয়ে বসে থাকে? প্রতিজ্ঞা বজায় থাকে কি?

* * *

'সুরঝঙ্কার'-এর মালিক পঙ্কজ ঘোষ কাতর অনুনয় বলেন, এটি আপনাকে করে দিতেই হবে মিসেস মৌলিক। মনে রাখবেন, সুরঝঙ্কার একা আমার নয়, আপনাদের সকলের। বিশেষ করে আপনার তো বটেই। আপনার স্নেহে-ভালবাসাতেই আজ সুরঝঙ্কার এতখানি হয়ে গড়ে উঠেছে।

সুরভি লজ্জিত ভাবে বলে, কী যে বলেন! আমি আবার কী করেছি? রুটিনমাফিক এসে কাজ সই করে চলেছি মাত্র।

পঙ্কজের স্ত্রী সায়ন্তনী বলে ওঠেন, একথা বলবেন না সুরভিদি! আপনার সহায়তা না পেলে—আপনার তো অজানা নয়, পাচ পাঁচটি মেয়ে নিয়ে আমাদের শুরু। তাও তার মধ্যে দুটি আমারই আত্মীয়র মেয়ে। আপনার কাছে কতদিন কত পরামর্শ পেয়েছি। আপনি হেসেছেন, বলেছেন, ছেলেমেয়ে মানুষ করে তোলার থেকে কিছু কম চিন্তা ভাবনা নেই আপনাদের এই সুরঝঙ্কারকে নিয়ে। ···আজ আপনাদের সকলের ভালবাসায়—

নিঃসন্তান এই দম্পতিটির সত্যিই এই ছোট্ট গানের স্কুলটি সন্তান-তুল্য। একে ঘিরে তাঁদের অনেক সাধ স্বপ্ন আশা। তা' স্বপ্ন ধীরে ধীরে সফল হয়ে চলেছে বৈকি। প্রথম দিকে আত্মীয়দের মেয়েদের ডেকে এনে, বিনা দক্ষিণায় শিক্ষা দিয়ে স্কুলের 'ঠাট' এনেছিলেন। আর এখন? ভর্তি করতে পেরে উঠছে না এত ভিড়।

তো সেই বাবদই ওঁরা ওঁদের একতলা ছোট্ট বাড়িটির একটু

এক্সটেনশন করতে চাইছেন, এবং দোতলায় পুরোটা একটা হল করতে চাইছেন। নাচের ক্লাসের জন্য। কিন্তু এতবড় একটি প্ল্যান তো আর নিয়মিত সব ক্লাস বজায় রেখে ঘটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই ওঁদের প্রস্তাব মাত্র ছ'সপ্তাহের জন্যে যদি সুরভি স্কুলটাকে তাদের বাড়িতে ঠাঁই দেয়। সুরভিদের বাড়িতে যে নিচের তলায় দু'দুখানা ভাল ভাল বড় বড় ঘর বেকার পড়ে থাকে, কিছু আলতু ফালতু জিনিস বুকে ধরে, তা ওঁদের জানা। পাড়ার ব্যাপার তো। অনেক দিন আগে একবার স্কুলের বাড়বৃদ্ধির মুখে সায়ন্তনী বলেওছিল, ঘর দুটো সুরঝঙ্কারকে ভাড়া দিন না সুরভিদি, তাহলে বেশ জম্পেস করে—

সুরভি হেসে উঠেছিল, ভাড়া দেবে 'সুরভিদি ?' সুরভিদি যেন বাড়ির মালিক।

আহা, মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি মানেই তো নিজের বাড়ি সুরভিদি। তাছাড়া তো শ্বশুর তো আপনাকে মেয়ের মতোই দেখেন। নিজে যত্ন করে নিয়ে এসে এখানে দিয়ে গিয়েছিলেন।

সে তো আলাদা ব্যাপার।

সুরভি হেসেছিল, বাড়ির আসল হেড্-এর বাড়িতে ভাড়াটাড়া বসানোর দারুণ আপত্তি।

শাশুড়ি ?

হুঁ। যাকে বলে ভীষণ অপছন্দ।

বলে কয়ে রাজি করানো যাবে না ?

মনে হয় মোটেই না।

অতএব সে প্রস্তাব চাপা পড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া সত্যি বলতে তখন আর্থিক অবস্থা তেমন অনুকূলও ছিল না। ঝোঁকের মাথাতেই বলেছিল সায়ন্তনী। এরকম ক্ষীণ একটু আশাও পোষণ করেছিল, হয়তো একটু সুবিধে দরেই পেয়ে যাবে। তো দরেরই প্রশ্ন ওঠেনি।

এখন হচ্ছে অন্য প্রস্তাব।

বাড়িতে যে সময়টা মিস্ত্রি লেগে থাকবে সেই সময়টুকুর জন্যে একটু ঘরদুটো ব্যবহার করতে দেওয়া। কনট্রাক্টার আশ্বাস দিয়েছে ছ'সপ্তাহের

মধ্যেই সবকিছু শেষ করে ফেলবে। তাহলেও অতগুলোদিন ক্লাস বন্ধ থাকবে? যারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ছাত্রী তাদের তো আবার সামনেই পরীক্ষা। কাজেই – এই উপায়টিই মাথায় এসেছে ওনাদের।

পঙ্কজ ঘোষের বিনীত নিবেদন, এরজন্যে সুরভি মৌলিকের বাড়ির আসল মালিক যা যা দিতে বলেন। ইঙ্গিতও দিয়েছেন একটু—ছ' সপ্তাহ বললেও ধরে নিতে হবে প্রায় মাস দুই। অতএব এ বাজারের রেট হিসেবে আন্দাজ করে তিন হাজার মতো দেবেন!

এখন তো তেমন অনটন নেই। অন্য কোথাও খোঁজ করতে যাবার অসুবিধে তো ঢের। এ একেবারে বাড়ির কাছেই—তাই না এত আকুলতা। সায়ন্তনী প্রস্তাব করল, তারা দু'জনে সুরভির সঙ্গে গিয়ে ধরাধরি করে মতটা আদায় করে নেবে। বরাবরের জন্যে তো চাইছে না। মাসদেড়েকের জন্যে একটু আশ্রয় দেওয়া।

সুরভির সেই সমস্যা। বাইরের লোকের কাছে সম্ভ্রম বজায় রাখার 'ভাড়াটে বসাতে আপত্তি' তার একটা যুক্তি আছে। থাকতেই পারে তেমন আপত্তি নীতিগতভাবে। কিন্তু সাময়িক একটু আশ্রয় দেওয়া? তাতে আপত্তির সপক্ষে যুক্তি কী?

সুরভির মনে হল, কিছুকাল আগে হলেও হয়তো সুরভি এতটা অসহায় বোধ করত না। হয়তো মৃগাঙ্ককে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নিয়ে সেই পৃষ্ঠবলে সর্বাণীকে যুক্তির জালে ফেলে আয়ত্তে আনতে পারত। "ভাড়া দেওয়া তো নয়, আশ্রয় দেওয়া।" মহৎ কাজ। একটা সুন্দর প্রতিষ্ঠান, কত সামান্য দিনে কতটা উন্নতি করে ফেলেছে, প্রতিবেশী হিসেবেও তো কিছু সহায়তা করা উচিত।...পাড়াপড়শীর ছেলেমেয়ের বিয়েটিয়েও তো লোকে অসুবিধে করে ঘর ছেড়ে দেয়।...এতে তো সর্বাণীর কোনও অসুবিধেই নেই।

এসব যুক্তি প্রয়োগ করা যেত হয়তো কিছুদিন আগেও। এখন সুরভি আগে থেকেই সব বিষয়ে সতর্ক থাকে পাছে তার কোনও কথা 'না' দাঁড়ায়। সে বড় অপমান। কিন্তু বাইরের লোকের কাছে ভিতরের দৈন্য প্রকাশ করে ফেলাই কি সম্মানের?

ঘোষ দম্পতি বলে উঠলেন, তাহলে বলুন কবে আপনাদের বাড়িতে আসছি? বলুন বলুন চটপট।

সুরভিকে অতএব হেসে ফেলতেই হয়।

বলে, দাঁড়ান, দাঁড়ান। একটু ধৈর্য ধরুন। আগে জলটল ঢেলে মাটিটা একটু ভিজিয়ে রাখি।

ঠিক আছে। তবে কণ্ট্রাক্টরের লোক তাগাদা দিচ্ছে— কবে কাজ আরম্ভ করবে। একবার এলিয়ে দিলেই তো হয়ে গেল। অন্য কোথাও কাজ ধরে বসবে।

সুরভি তবু হাসি বজায় রেখে বলল, তা আজ রাত্রেই তো লাগতে আসছে না?

ওরা হেসে উঠল।

হাসি। হাসি জিনিসটা কী সুন্দর।

অথচ মানুষ ইচ্ছে করে সেটাকে জীবন থেকে নির্বাসন দিতে চায়।

মূল ভরসা অবশ্য মৃগাঙ্কই।

কিন্তু মৃগাঙ্কও যেন কেমন অসহায় অসহায় হয়ে পড়েছেন আজকাল।

তবু তাঁকেই তার নিজের অবস্থা জানিয়ে বলে উঠল সুরভি, এমন মুশকিলে ফেলে বসল ওরা। অথচ—

মৃগাঙ্ক গলা নামিয়ে বলেন. না না, এটা তো তুমি ঠিকই বলছ বৌমা। প্রতিবেশী হিসেবে এটুকু করা তো খুবই উচিত। কিন্তু তোমার শাশুড়িটি যে আবার কট্টরপন্থী।

মাকে একটু বুঝিয়ে বলুন না। এটা তো ভাড়া দেওয়া নয়, হাসল একটু, 'আশ্রয়' দেওয়া। অবশ্য ওঁরা বলেছেন, এই বাবদ আপনারা যেমন বলবেন, ওঁরা তাতেই রাজি।

মৃগাঙ্ক এখন হাঁ হাঁ করে উঠলেন, সে কী! সে কী! ওর জন্যে আবার কিছু দেওয়া-দিই কী? সত্যিই তো পাড়ার লোক। যদি বিয়ে থাওয়া হত কারুর। ঘরটর ছেড়ে দিতে হত না, এটাই বুঝিয়ে বল গে তোমার শাশুড়ি ঠাকরুনকে।

সুরভি সামান্য একটু হাসল। তারপর বলল, আমিই যদি বলতে যাব, তবে আর আপনার কাছে দরবার করছি কেন বাবা?

মৃগাঙ্ক একটু চকিত হলেন। মেয়েটার মুখের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, ঠিক আছে আমিই বলছি!

*　　　*　　　*

কী ভাবে কী ভাষায় মৃগাঙ্ক সর্বাণীর কাছে, এই আর্জিটি পেশ করেছিলেন জানা নেই, তবে করেছেন তা জানা গেল সর্বাণীর পরদিনের সশব্দ স্বগতোক্তিতে...দ্রুত ভঙ্গিতে বাঁধাকপি কুচোতে কুচোতে সেই ভঙ্গিতেই বলেন, তোমার বাড়ি তুমি যাকে ইচ্ছে এনে বসাতে পার, আমার কী বলবার আছে? তবে ছুঁচ হয়ে ঢুকে না ফাল হয়ে বেরোতে চায় সেটাই দেখার। দেখা যাবে অবশ্যই। আমার আবার মতামত! আমি বাড়ির কে? তবে এও বলি—যাদের দরকার, তারা যদি কিছু দিতেও চায়, তাতে 'না' করবারই বা কী আছে, তাও তো বুঝি না। অভাবি তো নয়। দিতে সক্ষম বলেই তো দিতে চেয়েছে। দিতে হবে না বলে মহত্ত্ব দেখানো শুধু বাহাদুরি দেখানো বৈ তো নয়।

সুরভি আপন মনে ঘরের মধ্যে নিজের কাজ করতে থাকে, বোঝা যায় না এসব কথা তার কানে ঢুকছে। অতএব সর্বাণী ঈষৎ চঞ্চল হন। নিজেকে যেন খেলো খেলো মনে হয়। তাই ছেলেকে ডাক দেন, কঙ্ক বাড়ি আছিস?

করঙ্ক গালভর্তি সাবানের ফেনা নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসে, কিছু বলছ?

বলছি তোর বাবার ব্যাপারটি শুনেছিস?

করঙ্ক হাসার চেষ্টা করে বলে, তোমার 'ফাইলে' তো বাবার হরেক 'ব্যাপার'। তো এখন কোনটা?

কেন, তোকে কিছু বলেনি? বৌমাও না?

আমাকে? কই? কী হল? বিষয়টা কী?

শুনলুম বৌমার ওই গানের স্কুলের মালিক পঙ্কজবাবু নাকি বাজারবেলায় ধরেছিল ওঁকে, ওদের বাড়ি মেরামত হবে, দোতলা

উঠবে, মিস্ত্রি লাগবে, তাই কিছুদিনের জন্যে তোদের বাড়িতে যদি ইস্কুল বসাতে দেওয়া হয়।

আমাদের বাড়িতে!

না, এর বেশি আর এগোয় না করঙ্ক।

সর্বাণী বলেন, মানে, ওই তোদের একতলার ঘর তু'খানা। ওত্নটো খালি পড়ে থাকে বলে সর্বদাই সকলের চোখ টাটায়। ভাবছিলুম এবার থেকে না হয় একটা ঘরকে আকাশের পড়ার ঘর করে দিলে হয়। এরপর তো কলেজে উঠবে, বন্ধুটন্ধু আসবে। তা হঠাৎ এই ঝামেলা।

বাজারে ধরেছে।

সুরভি ঘর থেকে শুনে একটু থমকায়। মৃগাঙ্কর প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের পরিচয়ে কৃতজ্ঞ হয়, হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, তবু মনটা একটু বিষণ্ণ হয়ে যায়। খোলামেলা সুন্দর মানুষটি! বানিয়ে কথা বলার ধারটার তো ধারতে দেখা যেত না কখনও সংসারের সব লোকগুলো একটা সুড়ঙ্গ পথের মুখে এসে পড়ে ক্রমেই নিচের দিকে নেমে চলেছে। ...তবু ওই উদার স্নেহময় মানুষটার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যায় সুরভির।

করঙ্কর হাতে সাবান বুলোনো বুরুশ, তবু গালের ফেনা শুকিয়ে ওঠে। বলে, তাই না কি? তো বাবা কী বলেছেন?

তিনি আর কী বলবেন? তাঁর বুদ্ধির উপযুক্ত কথাই বলেছেন। এ আর কী ব্যাপার? বেশ তো! আপনার স্কুলের আয় উন্নতি হোক।

ওঃ। তো কবে আসতে চায়? অ্যাঁ?

তা জানি না। তোর বাপ তো বলল, কর্তা বলেছে,—কর্তাগিন্নি তু'জনে আসবে কাল পরশু, ভাল করে বলতে।

এর আর ভাল করে বলা-বলির কী আছে? বাবা যখন রাজি হয়ে বসেই আছেন।

বলে একটু হাসল করঙ্ক।

করঙ্ক মনে মনে বাবার সদ্‌বিবেচনার তারিফ করছে বৈকি। গতরাত্রে সুরভির কাছে শোনা বিবরণের সঙ্গে এ বিবরণের ফারাক অনেকখানি।

সর্বাণী বলে ওঠেন, চিরকেলে আলগা বুদ্ধি মানুষ। একবার তো বলতে হয় 'আচ্ছা বাড়ি গিয়ে পরামর্শ করে দেখি? তা নয়, বাজারের মোড়েই 'নিশ্চয়। নিশ্চয়! পাড়ার ব্যাপার এটুকু আর করব না?

বৌমার না হয় প্রাণের জায়গা, ওর কথা ছেড়ে দিই। তো আমার সঙ্গে কি তোর সঙ্গেও একবার আলোচনা করা উচিত ছিল না? হলেও তুমি বাড়ির কর্তা—

আমার কথা বাদ দাও। তবে তোমাকে একবার জিজ্ঞেস না করে কথা দেওয়াটা—

আমার তো বিশ্বাস তোর বাবা ইচ্ছে করেই জিজ্ঞেস না করে কথাটি দিয়ে বসেছে। প্রাণে ভয় আমি যদি ওনার মহত্ত্ব প্রকাশে বাগড়া দিই।

করঙ্ক বেশ জোর গলায় হেসে ওঠে, বাবাকে তো তুমি বেশ ভালভাবেই পড়ে ফেলেছ দেখছি।

তা আর ফেলব না? হাড়ে হাড়েই ফেলেছি। আজ তো আসিনি তোদের বাড়ি।

করঙ্ক সুযোগ পেয়ে হাওয়াটাকে হালকা করতে চেষ্টা করে। তাই এখন আরও জোরালো হাসি হেসে বলে, কী কাণ্ড! 'আমাদের বাড়িতে' এসে তুমি বাবাকে দেখতে শুরু করেছ অ্যাঁ?

সর্বাণীকেও অবশ্য এখন একটু হাসতে হয়, তো বাড়ি তো 'তোদেরই'। মৌলিক গুষ্টিরই। তো আরও শুনবি? পঙ্কজবাবু নাকি বলেছিল, এই মাস দুই আশ্রয় দেওয়ার জন্যে, আশ্রয়দাতা যা দিতে টিতে বলবেন, তাই দিতে রাজি তিনি। 'দু হাজার তিন হাজার' —তো মহাপুরুষ ব্যক্তিটি বলে দিয়েছেন, 'আশ্রয়ের' জন্যে আবার দামের হিসেব কী? কিচ্ছু দিতে হবে না।'

শুনে করঙ্ক নিশ্চিন্তের নিঃশ্বাস ফেলে।

গতরাত্রের 'মশারি নাটকের' সংলাপগুলো মনে পড়ে যায়।

সুরভি বলেছিল, 'সায়ন্তনীরা' ভাবে—এ সংসারের সবকিছু আমারই হাতে।

করঙ্ক বলেছিল, সেটাও অবশ্য ভাবা ঠিক হয়নি ওঁদের। মাথার ওপর বড়রা রয়েছেন।

তা হলে কী হবে? ভাবে আমি যখন এত আদরিণী, তখন—তো ওই সামান্য দিনের জন্যে টাকা দেওয়ার প্রস্তাবের ব্যাপারটায় বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল আমার, তবু নিজে থেকে কিছু বলতেও তো পারি না। তবে বাবাকে বলে দেখব, যদি ওদের সঙ্গে একবার দেখা করতে রাজি হন। তারপর যা হয় হবে। বলেছি বাবাকে তবে এত অস্বস্তি হচ্ছে!

এত অস্বস্তির কী আছে?

যদি কথাটা না থাকে? ওঁরা তো ভাববেন বাড়িতে আমি কেউ না।

করঙ্ক বলেছে, সেটা অবশ্য একটা কথা। তবে ওই টাকা ফাকার কথায় রাজি না হওয়াই ভাল। ওতে ওপক্ষে একটা দাবিভাব এসে যায়।

কাজেই এখন করঙ্ক একটু নিশ্চিন্তের নিঃশ্বাস ফেলে।

*　　　*　　　*

তবে সুরঝঙ্কার সেই নিশ্চিন্ততাটুকু থাকতে দেন না। ওঁরা বিশেষ আবেদন নিবেদন করেন, 'কিছু' নিতে। না হলে তাঁরা অস্বস্তি পাবেন। নিবেদনটি জানান আবার স্বয়ং সর্বাণীর কাছেই।

তা সর্বাণী কি তা বলে ব্যবহার খারাপ করেছেন তাদের সঙ্গে? মোটেই না। দিব্যি মাখন বোলানো কথাবার্তাই কয়েছেন। হেসে হেসেই বলেছেন, 'ভালই হল, দু'দশ দিন বিনা টিকিটে গানটান শুনতে পাব। ···তো ওই সব 'কিছু দেওয়াদিইর' কথা কেন? আপনারা যখন নিশ্চিত কথা দিচ্ছেন, স্থায়ী ব্যাপার নয়। মাত্র দেড় দুমাসের জন্যে—

তা হোক। আমাদেরও তো একটা মানসিক স্বস্তির দরকার! এমনিতে তো যথেষ্ট উৎপাত করা হবে আপনাদের ওপর।

তখন সর্বাণী হেসে বলেছেন, তবে আর কী করা? তাতেই যদি স্বস্তি পান যা ইচ্ছে করবেন।

আমাদের আবার 'আপনি' করে কথা কেন মাসিমা! তুমি বলুন।

ঠিক আছে। সত্যিই তোমরা তো আমার কাছে ছেলেমানুষই।

তারপর ডাক পেড়েছেন, অ বৌমা, কই কোথায় গো? এঁদের একটু চা'টা দাও।

সুরভি যে সেই 'ব্যবস্থাতে' ব্যস্ত, তা বুঝেও বলেন। সৌজন্য বলে কথা।

বাইরের চোখের সামনে কে আর রংচটে যাওয়া চেহারাটা দেখতে চায়? ঘরের দেওয়ালে কোনখানে একটু বালি খসে গেলে কি ড্যাম্প ধরা দাগ দেখলে হয়তো তার ওপর একখানা রংচঙে ক্যালেণ্ডার ঝুলিয়ে রেখে দাগটাকে আড়াল করার চেষ্টা হয়।

'কাটা কান চুল দিয়ে ঢাক'—এ তো শাস্ত্রবাক্য।

তবে ওরা যে সুরভিকে গৌণ করে সর্বাণীকে ধরতে এসেছে, এটি বিশেষ পুলকের।

পঙ্কজ-দম্পতি ফিরে যাবার সময় তাঁদের এগিয়ে দিতে আসা সুরভিকে বলে যান, 'যাই বলুন আপনি কিন্তু খুব লাকি। বাড়ির সকলেই কী ভাল। সত্যি বলতে আপনার শাশুড়ি ঠাকরুন সম্পর্কে বেশ একটু ভয় ভয়ই ছিল। দেখলাম চমৎকার মানুষ।

সুরভির নিঃশব্দে একটি নিঃশ্বাস পড়ে।

মনে হয় যেন কেউ একটা বালির প্রাসাদের প্রশংসা করে গেল।

অথচ কিছুদিন আগেও যেন প্রাসাদটা পাথরের বলেই মনে হত।

তবে এতে আর আশ্চর্যের কী আছে? 'অবিশ্বাস্য' বলে মনে করবারই বা কী আছে? প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে বিয়ে করে এবং সুখের সাগরে ভাসার চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হঠাৎ একদিন সেই বিয়েটাকে ভাঙার তালে আদালতে ছোটার দৃশ্য তো বিরল নয়।

কাচের বাসনে হঠাৎ একটু চিড় খেয়ে বসলে, সেটা বেড়েই চলে। নদীর পাড়ে অলক্ষে কোথাও ভাঙন ধরলে ক্রমশই সেটা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। তখন আর বালির বাঁধ কোনও কাজে লাগে না।

মন জিনিসটা কাচের মতোই ঠুনকো, নদীর মতোই পরিবর্তনশীল! ভাঙনের ধর্ম, কখনও কিছুটা স্তিমিত থাকে, কখনও হঠাৎ হঠাৎ দ্রুততা দেখায়। আর যখনই সেই দ্রুততা আসে, তখনই হয়তো নদী একটা বড় মোড় নেয়।

'সুরঝঙ্কারের' ধাক্কাটায় কি একটা মোড় নিল?

*　　　*　　　*

করঙ্ক বলল, তুমি কাল বলছিলে, শুনতেই 'আমাদের বাড়ি।' বাড়িটায় যদি 'আমাদের' কোন অধিকার থাকত, তাহলে কি পঙ্কজবাবুদের প্রস্তাবে এখন বিপদবোধ হত? বলে উঠতেই তো পারতাম, ঠিক আছে, চলে আসুন না। ···কিন্তু সত্যিকার মালিকটির অবস্থাও তো দেখলে? তাঁকেও গল্প বানাতে হল।

সুরভি বিষণ্ণভাবে বলল, সেই কথাই ভাবছিলাম।

আসলে শান্তিপ্রিয় লোকেরাই সবচেয়ে অসহায়।

সুরভি একটু হাসল, আর যারা তার ধার ধারে না, তারা সেই অসহায়তাটির সুযোগ নেয়। তবে হঠাৎ হঠাৎ কী মনে হচ্ছে জান? এই মিথ্যের প্রাসাদে বাস করে লাভ কী? প্রাসাদে থাকার গৌরব দেখিয়ে চলাটুকু?

করঙ্ক এরকম কথায় ভয় পায়। করঙ্ক অস্বস্তিবোধ করে। করঙ্ক এই সুরভির নাগাল পায় না।

তবু চলতেও থাকে সবই।

ভিতরের ছন্দটা আর অটুট নেই, মাঝে মঝেই বেসুরোয় তবু দৈনন্দিনের ছন্দটা মোটামুটি তালেই চলে।

শুধু বাড়ির সবচেয়ে বয়স্ক মানুষটা হয়তো আর হঠাৎ হঠাৎ বলে ওঠে না, বৌমা আজকের কাগজটা পড়েছ? নেতাদের কী সব আচার আচরণ হচ্ছে ক্রমশ! অ্যাঁ। বাড়ির সবচেয়ে দামি মানুষটা সারা-

দিনের পর খেটেখুটে বাড়ি ফিরে অনেক বেশি দামি একটি দৃশ্য দেখে তাজা হয়ে ওঠবার সুযোগ পায় না। নাঃ, সে আর বড় একটা বাড়ি ফিরে দেখতে পায় না তার মা আর বৌ একসোফায় ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে দূরদর্শনের পর্দায় চোখ মেলে বসে আছে। দুজনের কারো না কারো হয়তো সেই সময়ই খুব দরকারি কাজ পড়ে যায়।

তবে সেই অফিস মার্কা বাসটা থেকে ঠিক নির্দিষ্ট সময় নেমে পড়েই সেই দৃশ্যটা থেকে এখনও বঞ্চিত হয়নি লোকটা—সেই বারান্দায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা অপেক্ষমান দুটি মূর্তি।

কিন্তু বাড়ির সেই বড় হয়ে ওঠা ছেলেমেয়ে দুটো?

তাদের বোধহয় নিজেদের কেন্দ্রটি ছাড়া আর বিশেষ কিছু লক্ষে পড়ে না। যদি কোন সময় ছন্দভঙ্গের বেসুরো আওয়াজটা কানে ঠেকেও খেয়াল করে না সেটা একটা সুরহীন নিশ্চিত বেসুরো পথে গতি নিয়ে গড়িয়ে চলেছে। ভাবে এটা সাময়িক। তাই মাঝে মাঝেই তাদের পরিণাম চিন্তাহীন অসতর্ক উক্তি যেন ভাঙনের কাজটাকে একটু ত্বরান্বিত করে বসে।

যেমন সেদিন, খাবার টেবিলে বসে একজন অপরজনকে উদ্দেশ করে বেশ সোচ্চার মন্তব্য করে বসল। এই লক্ষ করে দেখছিস, দিদা আজকাল দিনের পর দিন একমনে কী চালিয়ে চলেছে! হি হি হি! রাজ্যের অরণ্য সম্পদ শেষ করে ফেলবে মনে হচ্ছে।

যা বলেছিস দাদা! মনে হচ্ছে দিদা ক্রমশ আমাদের ভেজিটেরিয়ান করে তোলার তালে আছে।

বার দুই 'দিদা' শব্দটা কানে যেতেই সর্বাণী আর নিজ কেন্দ্রে স্থির থাকতে পারেন না, রান্নাঘরের দিক থেকে সরে এসে বলেন, দুই ভাইবোনে 'দিদা দিদা' করে কী বলাবলি করা হচ্ছে শুনি?

ও কিছু না। আমাদের সিক্রেট কথা।

হুঁ। বুঝতে আর বাকি নেই আমার। 'দিদা' এখন ঘাসপাতা জঙ্গল চালাচ্ছে, এই তো?

আলো বলে ওঠে, তা চালাচ্ছই তো বাবা! কেবলই চচ্চড়ি

ফচ্চড়ি হ্যানো ত্যানো।

কেবলই চচ্চড়ি? রাঁধি না আর কিছু?

রাঁধবে না কেন? সেই 'মাছের ঝাল' আর 'ঝালের মাছ।' কেন বাবা তোমার সেই গোল্লা রুইয়ের চপ, ইয়া ইয়া ভেটকির ফ্রাইরা গেল কোথায়? ভাল রান্না টান্না ভুলে যাচ্ছ যে।

সর্বাণী রেগে বলেন, এরপর বাবার নামই ভুলে যাব বোধহয়। বলি যেমন বাজারের ছিরি, তেমনি রান্নার ছিরি হবে তো!

আহা, অমনি সেই বুড়ো ভদ্রলোকের ওপরে দোষ চাপানো। তুমি যা হুকুম করবে, তা না আনলে রক্ষে থাকে তাঁর? আসলে হি হি হি—বুড়ো হয়ে কিপটে হয়ে যাচ্ছ।

সর্বাণী ভারি গলায় বলে ওঠেন, তা এই কিপটে ঠাকুমার রান্নাঘরের ওপরই বা ভরসা করে থাকা কেন? তোদের সেই 'সুরুচি' 'সুখাদ্য' এইসব ভাল ভাল জায়গা থেকে ভাল ভাল সব চপ কাটলেট ফ্রাই কাবাব আনিয়ে খানাপিনা করলেই পারিস। দিদাই কিপটে, মা বাপ তো আর কিপটে নয়। ·· বলে গমগমিয়ে চলে যান।

কান বাঁচিয়ে কথা বলার জায়গা কম, তবু চেষ্টা করে সুরভি।

এক সময় ছেলেমেয়েকে বলে, তোমরা কি আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না ঠিক করেছ? সবসময় এমন অসভ্যতার মানে? দিদা বুড়ো হচ্ছেন না? বরাবর একরকম ভাবে খাটতে পারবেন?

আহা! এক্ষুনি এক্ষুনি অমনি বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। এদিকে তোমাকেও তো বেশি কিছু করতে দেয় না দেখি। আসলে ক্রমশ কিপটেমার্কা হয়ে যাচ্ছে। হি হি হি। একদিকে একগাদা টাকা ফেলে রেখে পচাচ্ছে, অন্যদিকে কিপটে হচ্ছে।

সেই অলক্ষিত 'একগাদা টাকার' 'পচে' যাওয়াটা কিছুতেই আর এদের মন থেকে মুছে যাচ্ছে না। অবিরত আক্ষেপোক্তির মাধ্যমে সেই পরম অপচয়ের স্মৃতিটাকে জিইয়ে রেখে চলে।

বলে, বুড়ো হলেই যত 'বোকামি আর সেন্টিমেন্ট' ঘাড়ে চাপে। তার সঙ্গে আবার কিপটেমিও।

সুরভি বাঁধ দেবার চেষ্টা করলেও, সে চেষ্টা টেকে না। ভাঙনের মুখে কি আর বালির বাঁধ টেকে? অতএব ওই ছোট ছুটোর বেআন্দাজি কথাকে কেন্দ্র করে মাঝে মাঝেই বেশ খানিকটা জল ঘোলা হয়।

সেই আর একদিন—।

কোন বন্ধুর বাড়িতে চমৎকার একটি কুকুরছানা দেখে এসে অভিযোগ উথলে উঠল আকাশের—এবং সে অভিযোগ বেশ সরবেই উচ্চারিত হতে থাকল। প্রথম তো সেই 'পুতুলের মতো' কুকুর শাবকের রূপলাবণ্যের বর্ণনায় বিগলিত হয় আকাশ এবং এখন থেকেই তাকে কী অপূর্ব ট্রেনিং দিচ্ছে তার পালকপিতা 'পল্টন', সে কাহিনীটি পেশ করে বলতে থাকে, পল্টনকে দেখে যা হিংসে হচ্ছিল। ইস! আমাদের ভাগ্যে আর ওসব হবে না। যা না একখানা শুচিবাই বাড়ি আমাদের। 'কুকুর' যেন নরকের কীট! কুকুর পোষবার নাম করলেই অমনি হয়ে যাবেন সবাই। পৃথিবীশুদ্ধ সবাই কুকুর পোষে, আর আমাদেরই—

সঙ্গে সঙ্গে আলোও পোঁ ধরে, যা বলেছিস দাদা, আমার তো প্রায় প্রত্যেকটি বন্ধুর বাড়িতেই কুকুর আছে। চুমকিদের বাড়িতে তো একটা বাঘের মতন কুকুর। চেনবাঁধা থাকে না, ইচ্ছে মতন ঘুরে বেড়ায়। আর অজপাদের বাড়িতে? কুকুরছানাটা ওদের বিছানায় শোয় ওদের সঙ্গে। অজপা বলে, মা আমাদের থেকে ওই 'মারাদোনা'-টাকেই বেশি ভালবাসে। হ্যাঁরে ওদের কুকুরের নাম মারাদোনা! সে তো আবার ওদের সঙ্গে টেবিলে চড়ে বসে একসঙ্গে খায়। অজপার মা খেতে খেতে তার ভাত মেখে দেয়।

আকাশ আরও উচ্চকিত উচ্চারণে বলে, শুনুক এবাড়ির সবাই একথা। সবাই নরকে যাবে, আর শুধু আমরাই স্বর্গে যাব। উঃ! আমাদের ভাগ্যেই এমন বাড়ি। কুকুরের নামে ঘেন্না।

দিদার 'শুচিবাই' ঘটিত অভিযোগ নতুন কিছু নয়, বরাবরই বলে

থাকে। দিদাকে ক্ষ্যাপানো, দিদাকে 'সেকেলে' আর গাঁইয়া বলে নস্যাত করা এটা ওদের একটি প্রিয় প্রসঙ্গ। আবার 'দিদা' বলতে প্রাণ বারও করে। তবে ক্রমশ বড় হয়ে নিজেদেরকে মস্ত একখানা তালেবর ভাবার ফলে ভাষার জৌলুসটা বেড়েছে। আমাদের না যা একখানি বাড়ি বলা তাদের অভ্যস্ত! এখন এই সারমেয় প্রসঙ্গটি সেই অভ্যস্ত ভঙ্গিরই একটু অংশ। কিন্তু সেদিন তারা এতে মস্ত একটা ঝড় তুলে বসেছিল।

সর্বাণী তেজের সঙ্গে নাতি নাতনিদের সঙ্গে ঝগড়া করে আর তাদের কুকুরপ্রেমী বন্ধুদের বাড়িগুলোকে হ্যানস্থা করে জিতে যাবার বদলে, অর্ধ ক্রন্দনের সুরে আক্ষেপ করতে লেগেছিলেন, তাঁর যে এই বাড়িটা ছাড়া আর কোনও গতি নেই। যদি যাবার মতো আর একটা কোনও চুলো থাকত, তাহলে, তিনি এ সংসারকে 'ফ্রি' করে দিয়ে বিদেয় হয়ে যেতেন। কিন্তু কোথায় তেমন চুলো? একটা মেয়ে পর্যন্ত নেই যে তার কাছে গিয়ে দশদিন থাকবেন। কত বাড়ির গিন্নির চার পাঁচটা সাতটা ছেলেমেয়ে, তাদের সর্বাণীর মতো এমন একদোরি হয়ে পড়ে থাকতে হয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই ঝড়কে সামলাতে সুরভিকে কম বেগ পেতে হয়েছিল? ছেলেমেয়েদের কাছে সেই কাতর আর্তনাদ, তোরা কি আমায় এ বাড়িতে টিকতে দিবি না? যাকে যা ইচ্ছে বলব, এমন অসভ্যতা শিখছ কোথা থেকে? সব বাড়ি কি সমান হয়?

এবং শেষমেশ বলে বসেছিল, আমার তো যাবার জায়গা আছে, চলে যাব ব্যস। তারপর তোদের যা ইচ্ছে করিস!

মৃগাঙ্কই শুধু বলেছিলেন, তুমি ওদের বকাবকি থামাও তো বৌমা। চিরকালই তো ওরা ওদের দিদা'কে ক্ষ্যাপায়। তিনি যদি হঠাৎ তিলকে তাল করে ছিঁচ কাঁদুনি মেয়ের মতো নাকে কাঁদতে বসেন ওদের কী দোষ? আমাকেও কি কম ক্ষ্যাপায়? ওতেই ওদের মজা!

সুরভিও হঠাৎ ছিঁচকাঁদুনির মতো হয়ে গিয়ে বলে, ওদের তো মজা, আমার যে সাজা। বড় হচ্ছে না? একটু ভদ্র সভ্য হবে না?

মৃগাঙ্ক সেদিন ঈষৎ গভীরভাবে বলেছিলেন, যেদিন ওরা নিজে থেকে সত্যি 'বড়' হয়ে উঠে সভ্য আর 'ভদ্র' হয়ে যাবে বৌমা সেদিন কিন্তু এই অ-সভ্য অ-ভদ্রদের জন্যেই মন হায় হায় করবে।

তা তিনি যাই বলুন, সেদিন জল বেশ খানিকটা ঘোলাটে হয়ে উঠল।

সর্বাণী থমথমে হয়ে কাটালেন কিছুদিন, আর তাঁর প্রতিপক্ষরা দু'জনে আড়ালে বলাবলি করতে শুরু করল, দিদা না, আজকাল যা বিচ্ছিরি হয়ে যাচ্ছে।

সর্বাণীর এই থমথমে ভাব দেখে মৃগাঙ্ক একদিন সাহস করে খুব মৃদু গলাতেই বললেন, সাধ করে ওদের 'আলো' আর 'আকাশ' নাম রেখেছিলে তুমিই সর্বাণী। জেনো ওরাই এ সংসারের 'আলো' আর 'আকাশ'।

আশ্চর্য, আজকাল মাঝে মাঝেই মৃগাঙ্ক ওই প্রায় ভুলে যাওয়া নামটা ব্যবহার করছেন।

সর্বাণী উথলে উঠে বললেন, তা খুব জানি। আর এও জানি আমিই এখন দিনদিন পাজি হয়ে যাচ্ছি। হল তো? ওরা আজকাল যা করে—

কী আশ্চর্য! ওরা তো বরাবরই তোমায় ক্ষ্যাপায়, ঠাট্টা করে।

ঠাট্টা করা আর হ্যানস্থা করা এক কথা নয়। শুচিবাই বলে যা বলে বলুক, তবে যখন বলে, আমি নাকি কিপটের হাড় হয়ে যাচ্ছি, আমি ক্রমশ ঘাসপাতা বনজঙ্গল খাওয়াচ্ছি তখন? যেন সেটাই আমার সাধ! আমারই যেন এত টানাকষা ভাল লাগে। তুমি এদিকে উত্তরোত্তর বাজার আগুনের কাহিনী শোনাবে, আর আমায় জব্দ করে রাখবে। তারজন্যে হ্যানস্থা খেতে হবে আমাকেই। এ যেন হয়েছে 'ঘর থাকতে বাবুই ভিজে।' 'গোলায় ধান থাকতে খুদ খাওয়া।' টাকার বাণ্ডিলগুলো তোমার পরকালে সাক্ষী দেবে।

সেই বাণ্ডিল!

ময়লা ময়লা সুতোয় বাঁধা আরও ময়লা সেই জিনিসগুলো মৃগাঙ্ক

যেটাকে কিছুতেই 'থাকা' ভাবতে পারেন না। সংসারসুদ্ধ সকলেই সেটাকে দস্তুরমতো 'থাকা'ই ভবে। তাই সর্বাণী অতি সহজেই বলে উঠতে পারেন, এ যেন হয়েছে ঘর থাকতে বাবুই ভিজে!

আচ্ছা, মৃগাঙ্কও যদি ওগুলোকে 'থাকা'র হিসেবে ধরতেন? এবং যদি এ সংসারকে সেই থাকার স্বাদ দিতে পারতেন? তাহলে কি তাঁর এই ছন্দে গাঁথা সংসারটার হঠাৎ এমন ছন্দভাঙা অবস্থা ঘটত না?

অবচেতনের গভীর তলে তলিয়ে গিয়ে সেই অবস্থাটি ভাবতে চেষ্টা করেন মৃগাঙ্ক, আর একটু গভীর সূক্ষ্ম হাসি ফুটে ওঠে মুখে। কদিন সে স্বাদ নিতে পারতেন? মনে পড়ে যায় করঙ্কর সেই প্রথম দিনের কথাটা। ও আর এমন কী বাবা? ইচ্ছে করলে কয়েক সপ্তাহেই কাবার করে ফেলা যায়।

কিন্তু সত্যিই তাই করলে?

আবারও একটু হাসি আসে। সংসার জায়গাটা বড় বিচিত্র। আজ যারা এসব কথা বলছে পরে, হয়তো তারাই বলতে থাকত, তখন অতগুলো টাকা খেয়ে মেখে এলোমেলো করে কাবার করা হল, থাকলে এখন দরকারের সময় কাজে লাগত!

তা দরকারের 'সময়' তো গেরস্থ ঘরে আসেই। মেয়ের বিয়ে, ছেলের উচ্চশিক্ষা, বড় কোন রোগব্যাধি, এসব তো অবধারিত। এখনও যেমন সংসার ওই 'থাকাটাকে কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারছে না তখনও পারত না। বলত, সেই টাকাটা এখন থাকলে—

হঠাৎ একদিন একটা শকুনি এই সংসারটার ওপর যে থাবা বসিয়ে বসেছে, তার থেকে আর রেহাই নেই। এখন কি হঠাৎ সেই থাবার তলা থেকে নিজেকে বের করে আনতে চেষ্টা করবেন মৃগাঙ্ক? করা সম্ভব?

*　　*　　*

তবু 'আলো' আর 'আকাশ' বলে কথা! হালকা হাওয়ার মতো।

'সুরঝঙ্কারের' পঙ্কজ দম্পতি বিদায় নিতেই তারা সেই তাদের চির

অভ্যাসে দু'হাত উলটে কৌতুকের গলায় বলে উঠল, হয়ে গেল। দুটি মাসের মতো আমাদের লেখাপড়ার বারোটা বেজে গেল। শুধু রবীন্দ্র-সঙ্গীত নয়, আবার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত! তার সঙ্গে 'নৃত্য'। একেবারে মারকাটারি অবস্থা!

আলো বলে উঠল, কিন্তু পরীক্ষার রেজাল্টটি খারাপ হলে আমাদের দোষ হবে। তখন?

সুরভি একটু বকুনির গলায় বলে, দু'মাসের মতন মানে? বলেছেন তো ছ' সপ্তাহ। তাও সারা সাতদিন নয় নিশ্চয়। সপ্তাহে মাত্র দু'দিন করে। অর্থাৎ হিসেব মতো স্রেফ বারোদিন, তাও মাত্র ঘণ্টা তিন চার করে। তাতেই তোমাদের রেজাল্ট খারাপ হয়ে যাবে?

আলো হি হি করে হেসে ওঠে, ও দাদা মার কী সাবজেক্ট ছিল রে? অঙ্ক বোধহয়? উঃ! কী পরিষ্কার মাথা! কী ফাইন হিসেব। 'বারো দিবসে' মাত্র ধরা যাক চার ঘণ্টা করেই—অর্থাৎ স্রেফ আটচল্লিশ ঘণ্টা। মা ছাড়া অঙ্কটা আর কারো এমন নির্ভুল হত?

আকাশ তার হেঁড়ে হয়ে যাওয়া গলায় বলে ওঠে, মার তো হবেই। মার হল ওই 'সুরঝঙ্কার' প্রাণের সার। কিন্তু দিদা? তোমার কী হল? তোমাকে তো বেশ শক্ত মহিলা মনে হত। একটু 'মাসিমা মাসিমা' করে গলে পড়ে দিব্যি কবজা করে ফেললেন তাঁরা? তুমি তো ওই 'সুরঝঙ্কারকে' দু'চক্ষের বিষ দেখ বাবা। অথচ--

সর্বাণী উত্তেজিত হন। দু'চক্ষের বিষ দেখি মানে? কবে আবার সে কথা বলতে গেছি তোদের?

আহা, ও কি আর ডেকে ডেকে বলতে হয়। দেখলেই বোঝা যায়।

হুঁ! খুব তোরা বুঝমান, থামতো!

বলে মৃগাঙ্ক প্রসঙ্গে যবনিকাপাত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ওরা তাতে রাজি হবে কেন? ওদের এখন 'মজা' চালাবার মন। তাই বলে, বরাবরই দেখি মা যেই ওই 'সুরঝঙ্কার'-এ যাবার জন্যে বেরোয়, তখনি দিদা মুখটা বাঁকায় আর হাঁড়ি মুখ করে বিড়বিড়িয়ে নিজমনে

কথা চালিয়ে যায়। হ্যাঁরে দাদা, ঠিক না?

কারেক্ট! অথচ আজ অমনি ভালবাসায় গলে গিয়ে—

আলো হঠাৎ হি হি করে বলে ওঠে, গলবে না? সুরঝঙ্কারের কর্তা গিন্নি যে অন্য একটি 'ঝঙ্কার' শুনিয়ে গেল দাদা! হি হি! তা নইলে কি আর দিদা—হি হি!

হঠাৎ ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

জীবনে কখনও যা ঘটেনি তাই ঘটল। সুরভি হঠাৎ এগিয়ে এসে তার ষোলো বছরের মেয়ের গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বলে উঠল, কী ভেবেছ তোমরা? অ্যাঁ! বাড়তে বাড়তে কোথায় উঠছ? অসভ্য ছোটলোক কোথাকার?

জীবনে প্রথম এই গালে চড়। তাও কিনা ষোলো বছর বয়সে এসে পৌঁছে। এর প্রতিক্রিয়া কী হবে কে জানে! আপাতত তো সে প্রতিবাদ মাত্র না করে এক ঝটকায় সরে গিয়ে তরতরিয়ে দোতলায় উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

মৃগাঙ্ক বলে উঠলেন, ছি ছি বৌমা! এটা কী হলো? তুমি ওকে—শিগগির দেখ গে রাগের মাথায় কী করতে কী করে বসে! আকাশ যা দেখ তো। ছি ছি ছি! কী হচ্ছে আজকাল বাড়িতে?

সুরভি প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে, কী করবে, ছাদ থেকে ঝাঁপ দেবে? তাই দিক! আমি আর পারছি না।

বলে। আবার নিজেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলেও যায় সিঁড়ি বেয়ে দোতলায়। না কি নিজেই আরও একটা সিঁড়ি ভেঙে প্রায় ভুলে থাকা তিনতলার ছাদে। আজ আর মনে থাকে না, এটা ওর বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াবার সময়।

সর্বাণী কি অনুভব করেন, এটা কেবলমাত্র ঝড় নয়, অশনি সঙ্কেত? তাই পাথর পাথর হয়ে বসে থাকেন অনেকক্ষণ!

কতক্ষণ? খুব বেশিক্ষণ কি?

চমক ভাঙল সদ্য গৃহ প্রত্যাগত ছেলের উদ্বিগ্ন ভয়াতুর কণ্ঠস্বরে, কী ব্যাপার? বাইরের দরজা খোলা! তোমরা এভাবে এখানে?

পরক্ষণেই মৃগাঙ্কর কণ্ঠস্বর, আশ্বস্তকারী।

না না কিছু না। এইমাত্র ওঁরা গেলেন কিনা। তো তুই এসে যাবি বলে আর—এখানেই তো রয়েছি।

ওঁরা! ওঁরা মানে?

হ্যাঁ সে খবরও খুব সহজ গলাতেই জানান মৃগাঙ্ক। ওই যে সুর-ঝঙ্কারের' ওঁরা।

ওঃ। তোমরা রাজি হয়েছে তো?

বাঃ, তাছাড়া?

বাঁচা গেল। আমার তো এভাবে দরজা হুহাট খোলা দেখে—

হ্যাঁ। হঠাৎ 'ভয়ঙ্কর' কিছু একটার ভয়ে হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠেছিল তার, গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। কারণ তারও আগেও তো একটা ভয়ানক ব্যতিক্রম দেখেছে। বারান্দায় পাশাপাশি ছুটো ছায়া দাঁড়িয়ে নেই রেলিঙে ভর দিয়ে। কোন কারণে ছুটো না হোক একটাও তো থাকবে। সেখানে দেখেছে শুধু শূন্যতা।...আর দ্রুতপায়ে চলে এসে দেখল দরজা খোলা। যা নাকি অভাবিতের কোঠায়। চোখের সামনে একটা কালো ছায়া ভেসে ওঠে।

তারপর এত নিশ্চিন্ততায় ভরা অনুকূল একটি খবর শুনে বলবে না 'বাঁচা গেল!'

*　　　*　　　*

কিন্তু তারপর? তারপর কি করঙ্ক নামের সেই লোকটার স্বপ্নভঙ্গ হল? একটা ভয়ঙ্করের মুখোমুখিই হতে হল তাকে। দেখল—

তার ষোলো বছরের মেয়েটা ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়েছে? অথবা মেয়েটার উনচল্লিশ বছরের মা-টাই?

না না। এতটা হতভাগ্য অভাগ্য ভাববার দরকার নেই বেচারাকে। সে যথারীতি যথাসময়ে হাতের কাছে চা পেল, খাবার পেল। কিছু কিছু খবরও পেল সারাদিনের। যথারীতিই রাত্রেও সবাই এক টেবিলে খেতে বসল। বাদে তার মেয়েটা। 'খিদে নেই' বলে যে অসময়ে শুয়ে পড়েছে।

তাই বলে কি মেয়েটা 'আমরণ অনশন' ব্রত নিয়ে বসেছে ? পাগল ! তাই আবার হয় ?···পরদিন সে ঠিকই সকালে খেয়েদেয়ে স্কুলে যাবে, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে টেবিলে বইখাতা আর ব্যাগ গুছিয়ে রাখা দেখে। তার সঙ্গে জলের পাত্রটাও যথাযথ।

অতএব নিশ্চিন্ত সর্বাণী ভাবলেন, মৃগাঙ্ক তখন কী বাড়াবাড়িই করলেন। যেন নাটক করে বসলেন। বেয়াড়া বেয়াদপ ছেলেমেয়েকে মা বাপ এক ঘা চড় বসিয়ে দেয় না ? সবাই দেয়। এ বাড়িতেই বেশি আতুপুতু।

তা হলে ? সেটা সর্বাণী না বলে ছাড়বেন কেন ? কম অপ্রতিভ হয়েছেন তখন ? তবে হ্যাঁ, নিশ্চিন্ত নিরাপদ একটু 'সময়' লাভের জন্য অপেক্ষা করেন।

এ সময় আর কেউ কথা কয়ে উঠে বাধা দিতে আসবে না।

ঘরের আধখানা জুড়ে মাঠ এর মতো সাবেকি জোড়া খাট। শৌখিনতার বালাই তেমন নেই গুমো গড়নের মোটা মোটা বাজুদার, ভারি কাঠের ছত্রি দেওয়া এই খাটখানি সর্বাণীর বিয়ের সময় বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া। অতএব অতীব আদরের। যদিও ছেলে বড় হয়ে উঠে, এবং তারপর তার ছেলেমেয়ে দুটোও এই খাটখানাকে উপলক্ষ করে সর্বাণীর বাবার সূক্ষ্মরুচি আর সৌন্দর্যবোধের তারিফ করে হেসে গড়িয়েছে। তবু এই খাটটিতেই সর্বাণীরা তাঁদের দশ-এগারো বছরের হয়ে যাওয়া ছেলেকে মাঝখানে নিয়েও প্রায় গড়াগড়ি দিয়ে শুয়ে কাটিয়েছেন। ···অতঃপর অবশ্য ছেলে পড়ার ঘরে শুতে চেয়েছে, পড়ার সুবিধের জন্যে। তখন তো সর্বাণীরা পুরনো বাড়িতে। সে বাড়িতে সর্বাণীর ভাগের ঘরখানার এ হদ্দ থেকে ও হদ্দ এই খাট।

তা এ বাড়িতেও এত বড় ঘরখানাতেও খাটটা প্রায় ঘরজোড়াই। তবু বুকজোড়া থেকেছে, যখন নাতি-নাতনিকে নিয়ে শুয়েছেন। কিন্তু তারাও খসে পড়েছে। ধারণা ছিল আলো অন্তত বরাবর ঠাকুমা ঠাকুর্দার ঘরেই শোবে, দু'জনার মধ্যমণি হয়ে, কিন্তু সেও একটু বড় হতেই 'দাদুর

যা নাকডাকে—' বলে পরিত্যাগ করে গেছে তাদের। তারও দাবি দাদার মতো 'নিজের ঘর'। তো হয়েছে তা। সুরভির ঘরের সংলগ্ন 'বক্সরুম' নামক জায়গাটিকেই সে দিব্যি সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে 'আমার ঘর' করে নিয়েছে। রাতে ঘুমের ঘোরে একটি কচি গায়ের স্পর্শের অভাব, বেশ কিছুদিন মনকে ফাঁকা ফাঁকা লাগিয়ে বিষণ্ণ করেছে। অতঃপর আবার সয়েও গেছে। এখন মনে হয় এটাই সুবিধের। দুটো মানুষের মনের প্রাণের কথা বলবার জায়গা! কারো ঘুম ভেঙে যাবে বলে সাবধান হতে হয় না।

আলোও 'নিজের ঘরে' চলে যাওয়ায় মৃগাঙ্ক একটু হেসে বলেছিলেন, 'এখন আমাদের কী বলা হবে বল?

'পূনর্মুষিক!' না আবার 'হনিমুন'-এর কালে গিয়ে পৌঁছনো?

সর্বাণী প্রায় সেই 'হনিমুন'-এর কালের ভঙ্গিতেই গায়ের কাছে লেপটে এসে চোখেমুখে ঝঙ্কার তুলে বলেছেন, কথার কী বাহার! 'পুনর্মুষিক!' কী দুঃখে? অ্যাঁ? বলো যে 'পুনর্নবদম্পতি'। শুধু আলাত পালাত গল্প চলবে বলে হেসেছিলেন।

তা সেই উজ্জ্বল উজ্জ্বল রাত আর এখন দেখা দেয় কই? এখন সর্বাণীর সব কিছু 'আলাত পালাত' গল্প এসে ঠেকেছে যেন কেবল অভিযোগে আর মৃগাঙ্ককে 'দু' কথা' শুনিয়ে দেওয়ায়।

আজ ঘরে এসে দেখলেন রাস্তার দিকে জানলাটা খোলা, পর্দাটা হাওয়ায় ওড়াউড়ি করছে, তার ফাঁক দিয়েই জোরালো খানিকটা জ্যোৎস্না এসে ঘর ভরে ফেলেছে। মাঠতুল্য খাটের একেবারে একধারে শুয়ে আছেন মৃগাঙ্ক জানলামুখো হয়ে।

চোখে আলো লাগছে যে—

বলে জানলাটা একটু ভেজিয়ে পর্দাটা ভাল করে টেনে দিয়ে খাটের ওপর এসে বসলেন সর্বাণী। এবং উঁচু পর্দায় গলা তুলে বললেন, কী? এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়া হল নাকি?

মৃগাঙ্ক এ কথার উত্তর দিলেন না। শুধু একটু নড়েচড়ে পাশবালিশটাকে আরও কাছে টেনে নিলেন। অর্থাৎ ব্যবধান একটা

থাকল।

সর্বাণী বলে উঠলেন, তখন তুমি এমন একখানা বাড়াবাড়ি ভাব দেখালে। যেন বেয়াড়া বেচাল ছেলেমেয়েকে মা বাপ শাসন করে না।

তথাপি ওপক্ষে নীরবতা।

অবিশ্যি ওনারও হল ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা! ছোট থেকে কখনও গুরুলঘুজ্ঞানের শিক্ষাটি পেয়েছে ওরা? কথায় বলে 'কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে টাঁশ টাঁশ।' এখন শাসন মানে, গোড়া কেটে আগায় জল!

মৃগাঙ্ক এখন খুব মৃদু ভাবে বলেন, তুমি কি সেই তখন থেকে ওই বাচ্চা ছুটোর জন্যে কথা শানাচ্ছিলে?

কথা শানাচ্ছিলাম? ওঃ। বাচ্চা! বাচ্চারা যে ক্রমেই আচ্চা হয়ে উঠছে খেয়াল রাখ? তখন আমাকে হেয় অপদস্থ করবার জন্যে মায়ের গানের ইস্কুলটার কথা তুলল দেখনি? ওর মাকে গানের স্কুলে যেতে দেখলেই নাকি মুখ হাঁড়ি করি আমি, বিড়বিড় করে কথা বলি। ··মনে জেন—বেচাল মেয়েকে শায়েস্তা করতে নয়, সেই রাগে আক্রোশেই বৌমা অতবড় মেয়ের গালে হাত তুলল। আমি কি আর কিছু বুঝি না?

মৃগাঙ্ক ঈষৎ কাতর ভাবে বলেন, আমার খুব ঘুম পেয়েছে।

* * *

কিন্তু কতদিন আর ঘুম পাওয়ার দোহাই দিয়ে চোখ বুজে থেকে আত্মরক্ষা করা যায়?

তো পাশের ঘরেও বোধহয় যুগল শয্যার একজনের খুব ঘুম পেয়েছিল, তাই অপরজন একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও জানতে পারল না, ওই সুরঝঙ্কারের 'কর্তা-গিন্নি'র সঙ্গে কী কী কথা হল সর্বাণীর। মাকে রাজি করাল কী করে!

ঘুমিয়ে পড়া মানুষ আর কী উত্তর দেবে?

অতএব নিঃশঙ্ক মানুষটা সকালে মেয়েকে বলে, কী রে কেমন আছিস?

মেয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, কেন, আমার কী হয়েছিল ?

বাঃ। কাল রাত্তিরে খিদে নেই বলে খেলি না।

মেয়ে ওই নিঃশঙ্ক মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখল। কী ও? ভান? না কি সত্যিই নিঃশঙ্ক? বড় পবিত্র মুখটা—লজ্জিত হল। বলল, সেটাও একটা ঘটনা ?

তা' খেলি না, সেটা ঘটনা নয়? বাবা হাসে, বলে জানিস না, 'রাত উপোসে হাতি কাবু।'

এটা সর্বাণীরই উক্তি।

সবসময় প্রবাদ বচন প্রয়োগে বক্তব্যকে অলঙ্কৃত করা সর্বাণীর চির অভ্যাস।

ওই 'হাতি কাবু' কথাটা নিয়ে এরাই কত সময় হেসেছে।

তার মানে বাবাকে কেউ কিছু বলেনি।

তা মা না বলতেই পারে, তাহলে নিজের ব্যবহারটি তো বলতে হবে! তো মা'র শাশুড়িটিও যে চেপে গেলেন বড় ?

যাক। আলো আর 'আলো আলো' থাকছে না। তার মানে মৃগাঙ্কর ভবিষ্যৎবাণীই ফলে যাবে। ওরা 'বড়' হয়ে উঠবে, আর তখন সেই গম্ভীর আর ভদ্র সভ্য বড় হয়ে যাওয়া ওদের দেখলে, দুটো হি হি করা ছেলেমেয়েদের জন্যে মনের মধ্যে একটা হায় হায় ভাব আসবে।

তবু তখনকার মতো বাবার কাছে বলে উঠল, হাতি কাবু হয়, মশামাছিরা হয় না!

তেমন হেসে টেসে বলল না। তবু বাবা বিশেষ কিছু ভাবল না। গতকাল যে কোনখানে একটা মস্ত ভাঙন ঘটে গেছে এমন অনুমান করল না।

মা আর বৌ দুজনেই যেন আজ স্তিমিত শান্ত মিতবাক। তো আজকাল তো প্রায়ই এমন হচ্ছে। সংসারের হাওয়াটা যে ভারি হয়ে উঠেছে, সেটা তো কিছুদিন থেকেই মালুম হচ্ছে। কী আর করা? পুরুষ জাতটার স্বভাবই হচ্ছে এইসব সূক্ষ্ম গোলমেলে অবস্থা দেখলেই সে তার থেকে পাশ কাটবার চেষ্টা করে। অর্থাৎ পালিয়ে

প্রাণ বাঁচানোটাই শ্রেয় পথ বলে মনে করে, সমস্যা আর জটিলতার মূল কারণ অনুসন্ধান করে তার নিরাকরণের চেষ্টার ধার দিয়ে যায় না!

টুটা ফুটাকে মেরামত করবার চেষ্টা না করে তার ওপর কিছু চাপাচুপি দিয়ে কাজ চালিয়ে চলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে। অথবা সাহসের অভাবেই তারা 'মূল' অনুসন্ধানের চেষ্টা করে না।

বারুদের বস্তায় কে আর সহজে হাত লাগাতে যায়?

* * *

তা নাড়াচাড়া করতে না গেলে অবশ্য বারুদের বস্তা বালির বস্তার চেহারা নিয়েই বসে থাকে!

'সুরঝঙ্কারের' ঘোষ দম্পতি প্রায়ই ঘোষণা করে যান আপনাদের সংসারটি দেখলে চোখ জুড়োয় সুরভিদি! আপনার কথা তো বাদ দিচ্ছি, অনেকদিন ধরেই দেখছি। এঁদের তো দেখা ছিল না তেমন। যেমন শান্ত শান্ত সভ্য ছেলেমেয়ে, তেমনি বাড়ির কর্তাটি। কী ভদ্র আর মার্জিত। আর আপনার শাশুড়ি? মানে মাসিমা? যেন একটি মাতৃমূর্তি। সত্যিই আপন মাসিমা পিসিমার মতো লাগে। আর কেমন হাসিখুশি। এখানে নেমে এসে গল্প করেন।

সুরভিকে সুখি সুখি আর হাসি হাসি মুখে এ সব শুনতে হয়।

বোকারা ছাড়া কে আর বলে ওঠে, আমার এই জমকাল পোশাকটা দেখে প্রশংসা করছেন? এটি কিন্তু ভিতরে ভিতরে ফেঁসে বসে আছে!

বোকারা বলে। পোশাকটা খুলে আর তুলে ধরে ধরে লোককে দেখিয়ে বেড়ায়, ভাবছ আহা কী চমৎকার। দেখ দেখ—সব ফেঁসে ফর্দাফাঁই। বলে। বলে বেড়ায়। কিন্তু সুরভি তো বোকা নয়।

তাই সুরভি তার মাসতুতো দিদিকে নিয়ে তার শাশুড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় সুখি সুখি আর হাসি হাসি মুখে। বলে ওঠে, এই দেখুন মা, মীনাদি এসেছে আপনার কাছে। মেয়ের বিয়ে, আপনাকে যেতেই হবে। না নিয়ে গিয়ে ছাড়বে না বলছে।

সুরভির নিজের দিদি নেই, এই মাসতুতো দিদিই আপন দিদিতুল্য!

কম বয়েসে মা মরা সুরভি আর তার ভাইরা মাসির কাছে অনেক আদর স্নেহ পেয়েছে। অতএব মাসতুতো দিদিই দিদি!

এবাড়িতে অনেক এসেছে মীনা, এবং সর্বাণীকে 'মাসি' ডেকে অনেক আদর খেয়েছে। স্বামীপুত্র সহ-ই এসেছে। সর্বাণীও গেছেন দু-একবার। অতএব মেয়ের বিয়ের সময় মাসতুতো বোনের শাশুড়িকেও অতি আপ্যায়নের গলায় বলতে হবে, 'যেতে পারব না' বললে ছাড়ছে কে? আপনি না গেলে আমার মেয়ের বিয়ে হবেই না। ···কী? হাঁটুতে বাতের ব্যথা? হোক গে। নাতনির বিয়ে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই গিয়ে নাতজামাই দেখবেন। এই সুরভি কিছুতেই মাসিমার ওজর আপত্তি শুনবি না। আর মাঝের এই দিনকটায় খুব করে শাশুড়ির পদসেবা করে চাঙ্গা করে তুলবি। মালিশ টালিশ করা হয় তো? দু'বেলার জায়গায় চারবেলা করবি।

মীনা এইরকম আতিশয্যপ্রবণই। তাছাড়া ওর ধারণা যেকোনও প্রতিকূলতাই ও আপন ক্ষমতায় অনুকূলে এনে ফেলার ক্ষমতা ধরে। তাই অন্যের ওপর আস্থা কম। মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছে বরটিকে 'কাটা সৈনিকের' ভূমিকায় রেখে। ওর বিশ্বাস লোকটা মোটেই ভাল করে বলতে পারবে না, কাজেই কেউই হয়তো আসবে না।

'একলা' তুমি? সে তোমার অফিসের বন্ধুদের করো গে। আর কোনখানে তোমায় ভরসা করে একা পাঠাচ্ছি না বাবা! হয়তো চিঠিখানা টেবিলে রেখে দিয়ে আড্ডা মেরে আর চা খেয়েই চলে আসবে। বলতে ভুলে যাবে 'যাবেন সবাই? নিশ্চয় যাবেন।'

তা বশংবদ স্বামীর ভূমিকা পালন করতে হলে, এসব কথা 'অমৃতসমান' করেই হাসিমুখে শুনতে হয় এবং নিজের ঘাটতি মেনেই নিতে হয়। সময় বিশেষে কাটা সৈনিকের ভূমিকাও পালন করতে হয়।

* * *

সুরভির বাপের বাড়ির দিকে কোনও নেমন্তন্নে যাওয়াটা সর্বাণীর

নতুন নয়। তার অনেক আত্মীয় না থাকলেও, আছে তো কিছু কিছু। তা গেছেন বেশ আহ্লাদে ভাসতে ভাসতেই। আলো আর আকাশ তখনও ছোট ছোট।

সুরভি শাশুড়ির সাজসজ্জায় আধুনিকতার ছাপ এনে দেবার চেষ্টা করে গুছিয়ে নিয়ে গেছে। অনেকে বলেছে, ওমা? তোর শাশুড়ি? চেহারা দেখে কে বলবে? যেন জা ননদ! রূপও আছে বাবা!

অতএব আহ্লাদে ভাসা মন নিয়ে ফিরেছেন সর্বাণী? তখন সুরভিও ভাবেন শাশুড়ি সঙ্গে গেলে আমার তো 'ফ্রি' ভাবটার বারোটা বেজে যাবে। তেমন হৈ চৈ করে আলগা হয়ে বেড়াতে পারব কি। ওনার জন্যে সদা সতর্ক থাকতে হবে।

না, আগে এরকম ভাবেনি কখনও। আজ ভাবল। ভাবল, মীনাদির আবার বেশি বেশি। এত বলার কী আছে? মাসতুতো বোনের শাশুড়ি না গেলে, তোমার মেয়ের বিয়ে 'অচল' হয়ে যাবে?

সুরভিবই স্বস্তি ঘুচে গেল। একেই তো ছেলে জবাব দিয়ে বসেছে, আমার দ্বারা ওসব বিয়েবাড়ির গোলমালে যাওয়া-টাওয়া হবে না। আমায় বাদ দাও। খোকার মতো মা-বাবার সঙ্গে নেমন্তন্ন যাওয়া! ধ্যাত!

আর মেয়ে?

সে এমন ঝেড়ে জবাব দিয়ে বসেনি বটে, তবে মেয়ে তো সেই 'চড়' খাওয়া অবধি 'তূষ্ণীভাব।' অতএব কী পরে যাবে কী সাজে সাজলে মানাবে, এসব আলোচনা চলবে না। গেলে? বর্তে সুরভি। অথচ এই সেদিনও মায়ের গলা ধরে ঝুলে বলেছে, 'মা'! তুমি কী মিষ্টি! মা এই শাড়িটা পরলে তোমায় কী সুন্দর দেখায়।

আচ্ছা, ওই চড়টা না বসালে কি আর অনেক অনেকদিন ছেলেমানুষ থাকত আলো নামের মেয়েটা? যে এখনও স্কুলের গণ্ডি পার হয়নি! কে জানে। ওটা হয়তো নিমিত্তমাত্র। এই প্রজন্মকে চেনা কঠিন। যে আহ্লাদি বেবি, এইমাত্র বাপির গলা ধরে ঝুলে চকোলেটের জন্যে বায়না করে সেই তৎক্ষণাৎই হয়তো এতটুকু উনিশ-

বিশে ফণাধরা ফণিনী হয়ে সেই বাপকেই ফোঁস করে ছোবল হানতে আসে !···

নাঃ নিজের পেটের ছেলে মেয়ের ওপর কোনও ভরসা নেই। শেষ আশ্রয় শেষ ভরসা শুধু 'পরের ছেলেটিই !'

*   *   *

সর্বাণী বললেন, তোমার মীনাদি যখন তোমাকে এতটা মান-সম্মান দিয়ে দিয়ে অত করে বলে গেল, তখন যেতে পারি আর না পারি ভালমত একটু কিছু 'লৌকিকতা' তো করতে হবে বৌমা। একটু সোনা না দিলে কি মানাবে ?

সোনা !

সুরভি শঙ্কিত হয়। এই ইচ্ছেটি তো তার নিজের মনের মধ্যেই লালিত হচ্ছে। মীনাদির মেয়ের বিয়েতে একটু সোনা দেবে। বেশি বলাবলির কিছু নেই, নিজের গহনা থেকেই ছোটখাট কিছু একটা দেবে দেখে শুনে। ···কিন্তু সর্বাণীও যদি সেই ইচ্ছে পোষণ করে বসেন ? সুরভির ইচ্ছেটা তো 'থো' হয়ে যাবে।

করঙ্ককে সুরভি কী জবাব দেবে ? কিংবা আপন ছেলেমেয়েকেই ?

আজকালের দিনে এক বাড়ি থেকে দুপ্রস্থ সোনা। পাগল নাকি ? মা দিলেই তো তোমারই দেওয়া হল! (উঠবেই একথা।) কিন্তু তাই কি ? একটা হল একান্ত স্নেহপাত্রীটিকে ভালবাসার 'উপহার' আর অপরটা হল কুটুমবাড়ির 'লৌকিকতা !'

সুরভি মৃদুভাবে বলল, ও বাবা! সোনা দেবেন ? আমি ভাবছিলাম বেশ ভাল দেখে দামি একটা শাড়ি টাড়ি—

সর্বাণী অগাধ উদারতায় বলেন, সেটাই না হয় তুমি দিও। আমায় অমন বড় মুখ করে বলে গেল— ! আমি একটু 'তেমন না করলে।'

'বড় মুখের' বদলে 'মুখটাকে তো বড়' করতেই হবে।

সর্বাণী তাঁর বৌমার ম্রিয়মাণ ভাব দেখেই বোধকরি আরও উৎসাহ বোধ করেন। বলেন, তোমার নিজের বোনঝির বিয়েতে আমি থাকি না থাকি—একেই দিই। তাছাড়া মীনা তো নিজেদেরই মতো !

সেটাও তো অস্বীকার করা যায় না! তবে সুরভি একটু অন্য প্রসঙ্গ পেয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি বলে, কী যে বলেন! নিজের বোনঝির সময় থাকি না থাকি মানে? রুবির মেয়েতো আট বছর পার করল।

তাহলেও আরও কুড়িটা বছর। আমার নিজের নাতনির বিয়েই দেখি না দেখি ঠিক কী! না না—মীনা যখনই বলেছে, আমি মনে ঠিক করে ফেলেছি। তুমি তো বিয়ে বাড়িতে যেতে গহনা বার করে নিতে 'ভল্টে' যাবে? সেই সঙ্গে আমার সেই যে একটা মিনে করা প্রজাপতি দেওয়া পেণ্ডেণ্ট আছে? মনে আছে তো? সেটা নিয়ে এসো। বলতে গেলে একদম নতুনই আছে, একটু পালিশ করে নিলেই, আর একটা 'কেস' দিলেই—

সেইটা।

চমকেই ওঠে সুরভি। তার মানে সুরভি যদি আলাদা করে আড়ালেও কিছু দিতে চেষ্টা করে, সর্বাণীর 'লৌকিকতার' কাছে তার 'উপহারটা' নেহাত নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। মিনে করা প্রজাপতি পেণ্ডেণ্টের কাছে —'অজন্তা' আংটি। · সেটা রীতিমত একটা গহনা।

সেইটা দেবেন। সেটা তো একটা বড় গহনা। চেনটা তো নেহাত সরুমার্কাও নয়! বেশ মোটা বিছে হারই।

তা হোক। ভেবেছি যখন! বার করে এনে দেখ হয়তো পালিশও করতে হবে না। বলতে গেলে তো পরিইনি।

কথাটা সত্যি!

আসলে জিনিসটার ইতিহাস এই—ওটা সর্বাণীর বিয়ের সময় এক বুড়ি দিদি শাশুড়ি দিয়েছিলেন। কবে যেন কার ওইরকম 'পেরজাপতি হার' দেখে পছন্দ হয়েছিল বলে সেটি গেঁথে রেখেছিলেন। তাছাড়া সে সময় 'একশো' টাকায় চড়েবসা সোনার ভরি হঠাৎ একলাফে নব্বুই টাকায় নেমে আসায় বেশ খোশমেজাজেই ভরিদেড়েক সোনা আর মবলগ দশ দশটি টাকা 'বানি' দিয়ে ঠিক তেমনি একখানি হার নাতবৌ সম্পর্কিত সর্বাণীকে দিয়ে বসেছিলেন বৌ-মুখদেখানি হিসেবে!

কিন্তু—কিছুকাল আগেও মিনেকরা গহনার রমরমা থাকলেও তখন সেটা 'অচল' হয়ে পড়েছে। তায় আবার 'পেণ্ডেণ্ট' নামক শৌখিন জিনিসে সূক্ষ্ম 'চেনের' বদলে 'বিছেহার' আর বুকের মাঝখানে - আড়ে দীর্ঘে বেশ জাঁদরেল একখানা রঙিন প্রজাপতি।...পরা যায়? অথচ আদর করে দেওয়া জিনিসটাকে ভেঙে ফেলতেও মন যায়নি। নিজের বৌকেও দিতে পারেননি 'সেকেলে' বলে!

কিন্তু এখন?

গহনার রাজ্যে সব অচল হয়ে যাওয়া পুরনো ফ্যাশানরা নতুন করে 'সচল' হয়ে উঠেছে। তাছাড়া—'সোনা'-র জিনিস যে 'ভারি হলে ফ্যাশানের হানি ঘটাতে পারে এমন অদ্ভুত কথায় আর বিশ্বাসী নয় মেয়েরা।

কাজেই এখন ওটা দেওয়া যায়।

বলতে গেলে দিলে 'ধন্যি ধন্যি'ই হবে।

তবু সুরভি বলল, তা না হয় ছোটখাট কিছু একটা কিনেটিনে দিলেও তো হত মা! ওটা আপনার একটা আশীর্বাদী পাওয়া জিনিস।

সর্বাণী মনে করতে থাকেন কুটুমবাড়িতে যে শাশুড়ির মুখটা 'বড়' হয় সেটা বৌ চাইছে না। তা তো চাইবেই না। এখন তো সেই আগের সরল মনটি নেই! ...তো নিজের এখনকার 'সরল' মনটি নিয়ে একখানি সরল হিসেবে আসেন সর্বাণী—ওটাই দিতে হবে।

তাই সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, কিনে দেওয়ায় কথা আর বোল না বৌমা। এখন চার আনা সোনা দিতেও তো কত টাকা বেরিয়ে যাবে। তাছাড়া আসছেই বা কোথা থেকে? তোমার দৃষ্টিকেপ্পন শ্বশুরটির হাতে পড়ে তাছাড়া কখনও কি কোথাও হাতমেলে কিছু করতে পেরেছি? আশীর্বাদী জিনিস আশীর্বাদেই যাবে। আলোর দশ বছরের জন্মদিনে তো একবার ওটা ওকে দিতে চেয়ে দেখিয়েছিলাম, তো মেয়ে নাক সিঁটকোল! নাঃ ওটাই নিয়ে এস।

একটানা এতগুলো কথার মধ্যে সুরভি আর এমন একটু ফাঁক পেল না যে, বলে ওঠে, আসবে কোথা থেকে? ভাবছেন কেন?

মুফতে পেয়ে যাওয়া সেই টাকাগুলো থেকে এখনও তা বেশ কিছু পড়েই আছে মনে হয়। শুনেছি মাসে মাসে মাত্র পাঁচশো করে নেওয়া হয়।

বলবে কখন ?

শেষ রায় তো উচ্চারিত হয়েই গেল।

ওটাই নিয়ে এস।

আলো ওটা দেখে নাক সিঁটকেছিল, এ ইতিহাসটি জানা ছিল না সুরভির। তবে 'অসম্ভব' কিছু নয় একটা দশ বছরের মেয়ের কাছে ফ্যাশানের থেকে সোনাটা বড় হয়ে ওঠবার কথা নয়।

হয়তো এখন, ওটা মীনামাসির মেয়ের গলায় উঠে গেলে আলো গলা তুলে বলে উঠতে পারে—ওমা! ওটা অন্য বাড়িতে চলে গেল! ইস!

* * *

দিনটা মেঘলা মেঘলা, শরীরটা তেমন ভাল লাগছিল না মৃগাঙ্কর। বাজার থেকে ফিরে বারান্দায় নিজস্ব ইজি চেয়ারটায় শুয়েছিলেন। হাতে খবরের কাগজ। তবে পড়তে মন লাগছে না।

কিন্তু ভঙ্গিটা স্বাভাবিক। তাই করঙ্ক বুঝতে পারল না বাবার শরীরটা ভাল নেই। কাছে এসে আস্তে আস্তে ডাকল—বাবা!

মৃগাঙ্ক সোজা হয়ে বসলেন।

করঙ্ক বলল, আজ ইয়ে সুরভিকে নিয়ে ব্যাঙ্কে যেতে হবে। ও ওই বিয়ে বাড়িতে যাবার জন্যে কিছু গহনা নেবে বোধহয়। তাছাড়া মাও যেন কী বলেছেন। …আজ তো আবার শনিবার। বারোটার আগেই যেতে হবে—

মৃগাঙ্ক বললেন, আজ বিয়ে ?

না। বিয়েটা কাল। কিন্তু কাল তো রবিবার।

ও। কিন্তু তুমি এখনও এভাবে ? চানটান করোনি ? অফিসের বেলা হয়ে যাবে না ?

করঙ্ক ঈষৎ লজ্জিত ভাবে বলে, না মানে, আজ একটা সি এল

নিয়ে নিলাম। কাজের চাপে নেওয়া তো হয় না। পড়ে পড়ে পচেই যায়।

লজ্জিত হবার কারণটা কী? বাবা যদি ভেবে বসেন শালির মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে ছুটি নেওয়া হল। অথচ কত সময়, কত দরকারে—

সত্যি পড়ে পড়ে তো পচেই যায় 'ছুটির' মতো ভয়ঙ্কর দামি একটা জিনিস। ...আশ্চর্য মানুষ একদিকে কত হিসেবি আবার অন্যদিকে কত অন্যমনস্ক। কতবড় দামি জিনিসের অপচয় ঘটায় অবহেলায় ঔদাসীন্যে। ব্যবহার না করে পচায়।

তা আজকের এই 'পচন নিবারণে'র খবরে মৃগাঙ্ক যেন বেঁচে গেলেন। বলে উঠলেন, ভালই হল। তাহলে তুইই যা না বাবা বৌমাকে নিয়ে। আমার আজ শরীরটা তেমন—

কেন? কী হল? বেশি কিছু?

না রে বাবা না। এমনিই মেঘলা মেঘলা দিনটা। ভাবছিলাম ভাতটা খাব কিনা। ও কিছু না। হয়তো খেতেও পারি। সে তুই যখন রয়েইছিস!

উঠে, আলমারি খুলে তার লকার খুলে ব্যাঙ্ক লকারের চাবিটা সাবধানে বার করে ছেলের হাতে দিয়ে বলেন, এটা নিয়ে যা। অন্যটা বৌমার কাছে রাখা আছে। দুটোই দরকার লাগবে। বৌমা জানে।

করঙ্ক ভুরু কুঁচকে বলল, দুটো দু-জায়গায় কেন?

সেটাই তো সেফ রে।

কার কাছ থেকে সেফ? চোরেদের কাছ থেকে? না নিজেদের কাছ থেকে?

এ প্রশ্নটা আর করল না করঙ্ক। শালির মেয়ের বিয়ের 'উপহার' দ্রব্য শাড়ি-টাড়ি এবং আরও কিছু কেনাকাটার জন্যেই ছুটিটা নিতে অনুরোধ করেছিল সুরভি। এটা বাড়তি যোগ হল।

তা হল সবই। পুরো একটা ছুটি। কম তো নয়। খুবই মূল্যবান। করঙ্কদের ব্যাঙ্কে তো আবার সম্প্রতি কাজ বাড়ায়

শনিবারে হাফ-ডে নয়। সবই মেনে নিতে হয়। যদিও এসব অলিখিত আইন। তাই আজ সাহস করে ছুটিটা নিয়ে ফেলেছে করঙ্ক।

কাজ সেরে চাবিটা বাবার কাছে ফেরত দিতে এসে করঙ্ক গলার স্বর নামিয়ে ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বলে, মেয়েদের যে কী বাতিক! বিয়ে বাড়ি যেতে হলে, যত গহনা আছে, সবগুলোই পরলে ভাল হয়। বললাম—দিনকাল ভাল নয়, বেশি নিও না। তো কে শুনছে?

হাতের ব্রিফকেসটা বাবার সামনে বিছানায় মেলে ধরে।

সুরভির কাছে আরও বহুবিধ প্যাকেট তাই 'আসল' জিনিসটা করঙ্ক নিজের হাতে রেখেছে। বলল, এই এতসব পরতে হবে। পুরো দুটো রাত বাড়িতে থাকবে এতগুলো সোনা। আর এই যে আবার একটা এটা মার—

তোমার মাও যাচ্ছেন নাকি?

না না! হেসে ফেলে করঙ্ক, এটা মা পরবেন? এইটা তো শুনছি মা মানাদির মেয়েকে দেবেন বলে ঠিক করেছেন।

মৃগাঙ্ক একটু অবাক হন।

এসব ঠিকঠাকের খবর তাঁর জানা নেই।

তা জানা থাকবে কী করে? সর্বাণী যদি খবরটি দিতে আসেন, মৃগাঙ্ক একেবারে সেন্টিমেন্টে ভেঙে পড়বেন না, তাঁর একদার সেই দাঁতফোকলা শনের নুড়ি চুল 'মেজদিদিমার' আশীর্বাদী জিনিসটি সর্বাণী বাড়ি ছাড়া করতে চাইছেন শুনলে।...ওই এক মানুষ চিরদিন এক ধরনের পচা সেন্টিমেন্টের বশেই চললেন। কবে একদিন সর্বাণী একখানা ছেঁড়া পচা পুরনো র‍্যাপার বাসনমাজুনী মেয়েটাকে দিয়েছিলেন তার শীত নিবারণার্থে, মৃগাঙ্ক অমনি বলে বসেছিলেন, 'যাহোক একটা চাদর-টাদর কিনে দিলেই পারতে! ওটা গায়ে দিয়ে মা সকালে চানের পর পুজো করতে বসতেন।'

সর্বাণী অতএব ওই 'প্রজাপতি রহস্য' ফাঁস করেননি। কিন্তু সেটা করঙ্কর জানার কথা নয়।

মৃগাঙ্ক ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে বলেন, এইটা দিয়ে দেবেন?

করঙ্ক অন্য ব্যাখ্যায় এসে বলে, আমরাও তো তাই বলছিলাম এমন কিছু নিকট সম্পর্ক নয় যে, লৌকিকতা হিসেবে এতটা দিতে হবে।

মৃগাঙ্ক শান্ত হয়ে যান। বলেন, সেজন্যে বলছি না। ওরা তো তোমাদের নিকটজনেরই মতো। বলছিলাম, এটা তোর মার বিয়ের সময় মেজদিদিমা নাতবৌয়ের মুখ দেখানি দেখেছিলেন।

ও বাবা! সে ঘটনা তোমার মনে আছে? অ্যাঁ মা যে বলেন তুমি দারুণ ভুলো।

মৃগাঙ্ক আস্তে বলেন, কিছু কিছু ব্যাপার মনে থেকে যায় রে।

কী জানি, মার যে কী এক খেয়াল চাপল। সামান্য কিছু কিনে দিলেই হত।···বলেই করঙ্ক অন্য প্রসঙ্গে এসে যায়। অথবা দুটো প্রসঙ্গের মধ্যে বন্ধন সূত্র রয়েছে। 'কিনে দেওয়ার' সঙ্গে যেটা যুক্ত।

বাবা! একটা ব্যাপার দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ঠিক বুঝতে পারলাম না। নিশ্চিত হতে ভাল করেই দেখে এলাম—

কী ব্যাপার রে?

মানে সেই 'প্রাণকেষ্ট।' সে তো দেখে এলাম একদম 'আনটাচড' রয়েছে! ব্যাপারটা কী?

মৃগাঙ্ক একটু হাসেন, টাচ্‌ করা হয়নি, তাই আনটাচড্‌ রয়েছে। এটাই ব্যাপার!

কিন্তু কথা তো ছিল অন্য রকম!

তা ছিল।

তাহলে?

মৃগাঙ্ক একটু থেমে গাঢ় স্বরে বলেন, ছাখ বাবা, হাত ঠেকাবার চেষ্টা করতে গেলেই কে যেন হাতটা চেপে ধরেছে। মনে হয়েছে যেন একটা ভিখিরির ভাতের থালায় খাবোল দিচ্ছি! ডাস্টবিনের মধ্যে থেকে খাবার খুঁটে খেতে যাচ্ছি।

করঙ্ক বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে প্রায় বোকার মতো। বাবাকে এ ধরনের ভাবুক বলে মনে হত না কোনদিন।

মৃগাঙ্ক বললেন, আমি হয়তো ঠিক বোঝাতে পারছি না।

করঙ্ক আস্তে বলল, পারছেন।

পারছি! তুই বুঝতে পেরেছিস!

তা পেরেছি।—করঙ্ক বলল, সেই একেবারে প্রথম দিকে আমারও যেন ওটায় হাত দেওয়া হবে ভাবলে কীরকম যেন 'চুরি চুরি' মনে হয়েছে। পরে মনটাকে ঝেড়ে ফরসা করে নিয়েছিলাম। লোকটাতো আর আমাদের কাছে বলেকয়ে গচ্ছিত রেখে যায়নি। তাছাড়া পরে তো জানতেই পারা গেল, আসলে লোকটা ঠিক ভিখিরিও নয়—

মৃগাঙ্ক একটু হাসলেন, সে তো শোনা কথাই। আসলে ওরা লোকটার শত্রুপক্ষ কিনা— কে জানে!

এ সব কথা ইতিপূর্বে কতবারই আলোচিত হয়েছে, এখনও আবার সেই কথাই। টাকাগুলোর ওপর কোনও নৈতিক অধিকার নেই এ সংসারের এটাই হচ্ছে কথা। অথচ ওটা এসে সংসারের ঘাড়ে চেপে বসে শান্তি নষ্ট করছে।

করঙ্ক বলল, অথচ এতদিন এক ধরনের নিশ্চিন্ত আছি ওটার একটা ব্যবস্থা হচ্ছে ভেবে। জিনিসটা তো 'বিপদ' তুল্যই। তাছাড়া এতদিন মাকেও তো বেশ অসুবিধেয় ফেলে এসেছ বাবা! সেটা জানলে—

আহা হা অসুবিধের আর কী এমন? চলেই তো যাচ্ছে। হয়তো বাহুল্যটার একটু কমতি হচ্ছে।

মৃগাঙ্ক এই হিসেবেই স্থির। বাহুল্যটার একটু না হয় কমতি হচ্ছে।

কিন্তু দিনের পর দিন যে ওই সূত্রেই কোথায় কী খামতি ঘটে যাচ্ছে সে হিসেব কি মৃগাঙ্কর খাতায় আছে? বাহুল্যটাই যে জীবন রস।

করঙ্ক ভল্টে গিয়ে 'প্রাণকেষ্ট' রহস্য ভেদ করে বৌকে বলেছিল, 'স্ট্রেঞ্জ'। আমি ভাবছিলাম বিপদ ক্রমশই হালকা হয়ে আসছে।

সুরভি হতাশ ভাবে বলেছিল, একটা 'সুব্যবস্থা' যদি মেনে চলা না হয়, কী করা যাবে? আচ্ছা, মাদার টেরেসার ওখানে দিয়ে দেওয়া যায় না? তাহলেই তো ল্যাটা চুকে যায়।

জানি না। কী যায় আর না যায়! তবে কিছু একটা করলে হঠাৎ

কোন বিপদ আসতে পারে। রাঘববোয়ালরা দেয়ালে সোনা গেঁথে রেখে পার পেয়ে যায়, গেরস্থ লোকেরা সামান্যতেই 'হ্যারাসাড' হয়।

লোকটা আমাদের পূর্বজন্মের শত্রু ছিল।

করঙ্ক হেসে ফেলে, সেটা প্রমাণ করতে পূর্বজন্ম পর্যন্ত পিছু হাঁটতে হবে কেন? এ জন্মেই তো মহা শত্রুতা করল। তবে—এও ঠিক এত বেশি নীতিবাগীশ হওয়াটাই একরকম নিজের সঙ্গে নিজে শত্রুতা করা।

করঙ্ক একরকম রেগেই চলে যায় সেখান থেকে।

অহেতুক কী এক জটিলতা সৃষ্টি করে বসে আছেন বাবা।

কোনও মানে হয় না। জিনিসটাকে 'উপিয়ে' ফেললে কি এরকম বুকের মধ্যে পাথরের ভার নিয়ে চেপে বসে থাকত? অথচ কী বা এমন টাকা? উপিয়ে ফেলতে কতক্ষণ?

আর মৃগাঙ্ক?

তিনিও আজ সেই একই ব্যাপারে নতুন করে একটা ধাক্কা খেয়ে, আবার ভাবনা শুরু করেন।

ভাবনাটা ক্রমশ ছেলেমানুষের পর্যায়ে পৌঁছচ্ছে। ভাবতে চেষ্টা করছেন কতদিন আগে কবে যেন মৃগাঙ্ক মৌলিক নামের লোকটা ভারি সুখি সুখি আর নিশ্চিন্ত নিশ্চিন্ত ছিলেন? আবার সেই অবস্থায় ফিরে যাওয়া যায় না? বিশ্রি ওই এক অশান্তির মূল ময়লা নোটের তাড়াগুলো যদি উপিয়ে দেওয়া যায়?

কবে যেন আলো আকাশ কেবলই বলতে শুরু করেছিল তাদের প্রত্যেক বন্ধুদেরই নাকি টিভি ও ভি সি আর আর আরও কী সব যেন আছে। ক্যাসেট ভাড়া করে এনে রোজ রোজ নতুন নতুন ছবি দেখে, গান শোনে।

হ্যাঁরে, তারা লেখাপড়া করে না?

করবে না আবার কেন? করে। ভাল রেজাল্টও করে। মৃগাঙ্কদের আমলের মতো তো আর 'গোবরভরা মাথা ভাল ছেলে' নয়, যে রাতদিন শুধু পড়ার বই নিয়ে পড়ে থাকবে?

কবে যেন সুরভি হঠাৎই বলতে শুরু করেছিল, একটা ওয়াশিং মেসিন আর একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার —কিনে ফেললে আর কাজের মেয়েদের তোয়াক্কা করতে হয় না! নিজেরাই সবকিছু অনায়াসে করে নেওয়া যায়।

কবে কখন কোন সময় সুরভির মাথায় এই বুদ্ধিটা খেলেছিল? সেই প্রাণবেষ্ট-পর্বর পরই না? —ওই সব জিনিসগুলো কিনতে তো একইঙ্গে সব দামটা না মেটালেও চলে বাবা, ইনস্টলমেণ্টের ব্যবস্থা রয়েছে। —তার মানে ধীরে ধীরে উপিয়ে ফেললে ধরা পড়ার ভয় থাকে না।

হ্যাঁ ঠিক সেই সময় সর্বাণীও বলতে শুরু করেছিলেন, আজকাল আর ভাল ভদ্দরলোকদের বাড়িতে সাদাকালো টিভি দেখা যায় না। অনেকে সেগুলো বাতিল করে রঙিন কিনছে!

হ্যাঁ, এও সেই কাছাকাছি সময়ে। সেই ছেঁড়া গামছার পুঁটুলিটা খুলে ফেলে তাজ্জব বনে যাবার পর!

মৃগাঙ্ক না বোঝবার ভান করে এটা ওটা বলে এড়িয়ে গেছেন। সুরভিকে বলেছেন, বিদ্যুৎই তো সব সময় বেপাত্তা বৌমা, বিদ্যুৎচালিত যন্ত্ররা কত আর সুবিধে দিতে পারবে? জিনিসগুলো বাড়ির জঞ্জাল বাড়াবে মাত্র। তোমার ওই কাজের মেয়েদের তোয়াজ করতেই হবে।

সর্বাণীকে হেসে হেসে বলেছেন, কী গো, মনোভাবটা তো সুবিধের মনে হচ্ছে না। এ বয়সে 'সাদাকালো' মার্কা ছেড়ে রঙিনে মন? বলে নিজের কাঁচাপাকা চুলে ভরা মাথাটায় একবার হাত বুলিয়েছেন।

হাসেননি সর্বাণী! খুশি হয়নি কেউই।

ক্রমশ অবশ্য এসব নিদেন নিবৃত্ত হয়ে গিয়েছিল মৃগাঙ্কর নির্বেদ নিরাসক্তিতে। তিনি ভাব দেখিয়েছেন যেন ওগুলো এমনি কথার কথা। ওর পিছনে কোনও ইশারা নেই।

অতঃপর ধীরে ধীরে সংসারের হাওয়া ভারি হয়ে উঠেছে। যেমন হয় নির্মল আকাশে আস্তে আস্তে ঈশান কোণে মেঘ জমলে। এবং সর্বাণী রঙিন টিভি'র কথা ভুলে গিয়ে গাইতে শুরু করেছিল, জন্মজীবনে

তীর্থধর্ম হল না। অতঃপর তাও একটা ক্লেদাক্ত ইতিহাস সৃষ্টি করে থেমে গেছে।

এসবই কি তাহলে মৃগাঙ্কর ভুল হিসেবের ফল? অথবা মৃগাঙ্কর বোকামির ফসল?

তো এখনও কি সে ভুল শুধরে নেওয়া যায় না? মৃগাঙ্কর নিজের হিসেবের খাতাখানা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে!

এখন করঙ্ককে ডেকে বলে দেওয়া যায় না, দেখ তোর কথাটথার পর হঠাৎ মনে হচ্ছে, সত্যি অমন বোকামির কোন মানে হয়নি। এখনও জঞ্জালটা বুকে বয়ে বসে থাকার মানে নেই। এমন কিছু দু'পাঁচ লাখ নয়, ইচ্ছে করলে একদিনেই হাল্কা হয়ে যাওয়া যায়।

হ্যাঁ, হাস্যকর হলেও সত্যিই অন্ধকারে ইজিচেয়ারে পড়ে থেকে এই রকম হাস্যকর চিন্তাই করে চলছিলেন মৃগাঙ্ক। আর কল্পনা করছিলেন জমাটবাঁধা মেঘটা যেন আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। —ভুল শোধরালে মেঘ কাটে না?

কিন্তু হাস্যকর ব্যাপারটা হাস্যকরই। এবং একটু পরে রাতে খাবার টেবিলে ছেলের সঙ্গে মুখোমুখি বসে, মৃগাঙ্ক সেই হাস্যকর তানটি অনুভব করলেন। ওই ভাবলেশশূন্য মুখটার দিকে তাকিয়ে কি হঠাৎ উচ্চারণ করে উঠবেন, 'ছাখ ভেবে দেখলাম, সত্যিই এই বোকামির কোনও মানে হয় না—'

আর কেউও শুনবেই অবশ্য।

করঙ্কর মতোই প্রায় ভাবলেশশূন্য আর একখানা মুখ! নির্বাক নয়, অথচ 'সবাক'ই কি বলা যায়?

একজন অবশ্য সবাক আছেন ধারে কাছেই, বেজার মুখ, ঘন ঘন হাইতোলার সঙ্গে সঙ্গে বলে চলেছেন, 'বাসন তো জমছে ঢের। সকালে 'তিনি' এলে হয়। আজ যা মেজাজ দেখিয়ে গেছেন। —তার সঙ্গেই মশার আধিক্য লোডশেডিংয়ের বাড়াবাড়ি এরাও চলে আসছে সেই প্রসঙ্গের সমান্তরালেই।

প্রসঙ্গটা প্রধানত তো 'জ্বালার'ই। এটা সর্বাণীর স্বভাবগত।

আগে শুনলে সবাই হাসত, এখন আর কেউ হাসে না।— তাছাড়া সেই হাসির আধাররাই বা কই ?

একটা ঘটনা লক্ষ করছেন মৃগাঙ্ক। আজকাল রাতে খাওয়ার টেবিলে আলো আর আকাশকে দেখা যায় না। এরা আগে খেয়ে নেয়। পড়ার জন্যেই হোক অথবা ঘুমের জন্যেই হোক।

অথচ কিছুকাল আগেও কিছুতেই তাদের আগে আগে খাইয়ে নেওয়া যেত না। সবাইয়ের সঙ্গে খাব বাবা, এক্ষুনি খেয়ে নিতে হবে কী জন্যে ? খাবারগুলো কি পালিয়ে যাচ্ছে ? বলে ঝঙ্কার দিত।

* * *

সর্বাণী আশা করেছিল, সুরভি হয়তো বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরে এসে বেশ অভিযোগের অভিব্যক্তি দিয়ে গল্প করবে। সর্বাণীকে সুরভি টেনে যেতে না পারায় কী দুঃখিত যে হল মীনাদি। শুধু মীনাদি কেন সবাই ! —আবার হয়তো বা সর্বাণীর আশীর্বাদী গহনাখানি যে সকলের কী পছন্দই হয়েছে সে কথাটাও জানাবে। —হয়ত বা মাসিমা এলেন না এত মন খারাপ লাগছে বলে একগাদা মিষ্টি ফিষ্টি চাপাবে মীনা-সুরভির ঘাড়ে।

কিন্তু আশ্চর্য, সে দিক দিয়েই গেল না কথা।

বিয়ে বাড়িতে যে 'জেনারেটার' রাখা সত্ত্বেও ঠিক বর আসার সময়ই হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে যাওয়ায় কী দারুণ অসুবিধে হয়েছিল সেইটাই শোনা গেল তার মুখে। আর কথাগুলো বলতে গেলে মৃগাঙ্ককেই উদ্দেশ্য করে।…

জেনারেটার রাখলে কী হবে ? তাকে চালু করতেই তো কতক্ষণ দেরি।

তবু সর্বাণী একবার মান খুইয়ে বললেন, 'বর' কেমন হল ?

সুরভি উত্তর দিল, গুণে অবশ্য খুবই ইয়ে, তবে দেখতে মোটামুটিই।

অন্য এক সময় আরও একবার মান খোওয়ালেন মহিলা। একবার

ছেলেকে একান্তে পেয়ে বললেন, 'আমার কথা কিছু বলল না কী মীনা?

ছেলে অবাক হয়ে বলল, তোমার কথা?

মানে গেলাম না বলে? অনেক করে বলে গিয়েছিল—

করঙ্ক সে কথা নস্যাৎ করে দিল! সে বলতে হয় তাই বলা। মীনাদি তো আবার আছেই একটু বাক্যবাগিশ। তুমি সত্যি যাবে, তা ভাবেওনি। হাঁটু ফাঁটু শুনিয়েছো তো খুব!

আর কী বলার আছে?

এখন যদি সর্বাণী হঠাৎ মনে করে থাকেন, সত্যিই আমার বেশ বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। রীতিমত বোকামিই করে বসেছি! অমন একখানা গহনা—মরতে আমি একটা বাজে জায়গায় দিয়ে মরলাম! পুরনো কালের একটা স্মৃতিচিহ্ন!

'ভুল করে মরেছি', এই আত্মগ্লানি বড় বেশি যন্ত্রণাদায়ক। অতএব তখন সে কেবলই ওই 'মরে' বসার পরিপ্রেক্ষিতে অপর জনকে দোষি খাড়া করতে বসে। যে মীনার গুণে ধন্যিধন্যি করেন সর্বাণী, সেদিন পর্যন্তও করেছেন, আজ মনে মনে তার উদ্দেশে অনায়াসেই নিরুচ্চার উক্তি চলতে থাকে, ঢঙিনি।...আদিখ্যেতার জাহাজ!...আপনি না গেলে আমার মেয়ের বিয়েই হবে না! ন্যাকা!...

তা মনের মধ্যে প্রবাহিত ভাষা তো রাজার মাকেও ডাইনি বলে।

কিন্তু ভুল জিনিসটা এমন বিচ্ছিরি ব্যাপার যে একবার করে ফেললে আর তা ফেরানো যায় না। মৃগাঙ্কই কি পারলেন! তাঁর 'ভুলটা'কে ফেরাতে? নিজের কাছেই নিজে হাস্যাস্পদ হলেন। তবে, সবটাই মনে মনে এই যা রক্ষে।

অথচ এই প্রচ্ছন্ন প্রবাহের ওপর দিয়ে খেয়া নৌকারা ঠিকই পারাপার করে চলে। 'দৈনন্দিন জীবন' মানেই তো দৈনন্দিন খেয়া পারাপার। খেয়া নৌকোর তো কোনও সুদূর লক্ষ্য থাকে না। সুদূর লক্ষ্যের নদী আলাদা, নৌকো আলাদা।

*　　　*　　　*

ওই পারানির নৌকোয় পার হয়ে এসেই সর্বাণী প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে বলেন, এই ত্যাখো কাণ্ড বৌমা! তুমি বাড়ি ছিলে না, সেই সময় তোমার সায়ন্তনীরা দু'জনায় এসে অনেক ধন্যবাদ টন্যবাদ দিয়ে এই তিন হাজার টাকা গছিয়ে দিয়ে গেল। তার সঙ্গে এই অ্যাত বড় এক বাক্স সন্দেশ!

সুরভি নিরুত্তাপ গলায় বলল, 'গছিয়ে যাওয়া' আর কী? দেবার কথাই তো ছিল।

অনেক 'না না'ও তো করা হয়েছিল বাপু! তাছাড়া এই ক'দিনের মেলামেশায় আত্মীয়তা মতোও তো হয়ে গেছল। নাও ধর বাছা। তুলে রাখ।

সুরভি থমকে বলল, আমি নেব কী জন্যে?

তা তোমারই তো চেনাজানা?

'চেনাজানা' বলে তো দেননি, দিয়েছেন ঘরের ভাড়া হিসেবেই।

আচ্ছা, কথাটার মধ্যে কি কিছু ভুল ছিল?

তবু হঠাৎ সর্বাণী ভয়ানক অপমানিত বোধ করলেন। মনে হল সুরভি কি এর আগে কখনও এমন তাচ্ছিল্য ভরে কথা বলেছে?

'তাচ্ছিল্য'ই মনে হল সর্বাণীর।

ভারি মুখে বললেন, ঠিক আছে। যার বাড়ি তাকেই দিচ্ছি গিয়ে। আমি যে বাড়ির দাসীবাঁদি বৈ নয়, একথাটা তো বাইরের লোকেরা বোঝে না।

গমগম করে ঘরে চলে যান সন্দেশের বাক্সটা খাবার টেবিলের ওপর বসিয়ে রেখে। যেটা একান্তই তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। ওই বাক্সটি হাতে নিয়ে জনে জনে সকলকে খোসামোদ করে খাইয়ে ছাড়াই সর্বাণীর চির স্বভাবগত।

কিন্তু মৃগাঙ্কই বা কোন মান রাখলেন সর্বাণীর?

অনায়াসেই বললেন, ও তোমার কাছেই রাখ না!

কেন? আমি কি বাড়ির মালিক?

মালিক না হলেও 'মালিকানি।'

অত মান্যয় দরকার নেই আমার। তোমার বাড়ি তুমি বুঝবে।

আমি তো আগে বুঝতে চেয়েছিলাম। বুঝেই ফেলেছিলাম এটা একটা অস্বস্তির ব্যাপার হবে। শেষ পর্যন্ত তো—

অস্বস্তি অবশ্য হচ্ছে সর্বাণীরও। কিন্তু এখন আর উপায় কী? টাকাটা গায়ে ফুটছে। তবু এক সময় ভাবেন, 'ছেলে তবু আপনজন' তাকেই বলি যদি একটা বিহিত করতে পারে।

কঙ্ক রে, একটা কাজ করলে কী হয়? এই টাকাটা দিয়ে যদি ওই পঙ্কজবাবুদের উপহার বলে কিছু কিনে দেওয়া যায়? তাহলে অস্বস্তিটা কাটে।

করঙ্ক ভুরু কুঁচকে বলে, খামোকা উপহার?

করঙ্ক কি আগে এমন ভুরু কোঁচকাতে অভ্যস্ত ছিল?

আহা! নতুন দোতলা হল, ঘর সাজানোর মতো কিছু দিতে পারা যায় না। কিংবা সায়ন্তনীকে একখানা ভাল শাড়ি টাড়ি—আর

পাগলের মতো কথা বোলো না। ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা। আশ্চর্য! তোমার তো শুনি কখনও কিছু 'সাধ মেটে না! সেটাই বরং কিছু মেটাও।

চুপ করে যান সর্বাণী!

প্রায় পাথরের মতো হয়ে যান। আর কথা বাড়াবার ক্ষমতা থাকে না। এরপর কথা বলতে গেলে চোখের জলও যে তাঁর মান রাখবে না।

কত দূরে চলে গেছে কঙ্ক!

কখন কোন ফাঁকে এত দূরে চলে গেল!

কিন্তু পাগলের মতো কথা বোল না মা, অথবা বোকার মতো কথা বোল না মা, এমন কথা কি ইতিপূর্বে আগে কখনও বলেনি?

বলেছে বৈকি। হরদমই বলেছে। ওটা প্রায় ওর কথার মতো।

আর সর্বাণীও যে তেমন কথা না বলেছেন তা তো নয়।

হ্যাঁরে কঙ্ক বড় অফিসার হলে শুনি অফিস থেকে গাড়ি দেয়, তোকে দিচ্ছে না কেন? বলে দেখ না একবার বড়কর্তাকে?

ছাথ কঙ্ক, ছাতে বড়ি আচার এইসব শুকোতে দিলে কাকে কী উৎপাতই করে। ছাদের মাঝামাঝি একখানে একটা তারের জালের ঘর করলে হয় না? দেখ না চেষ্টা করে।

মাঝামাঝি!

হ্যাঁ, তাহলে সারাটা দিন টানা রোদ পাবে, ছায়া পড়বে না।

তা এরকম কথার উত্তরে কঙ্ক আর কী বলবে?

মার বোকামি অথবা পাগলামি নিয়ে অনায়াসে তার বাবার সঙ্গে কিংবা বাবার নাতি-নাতনির সঙ্গেও হাসাহাসি করেছে কঙ্ক, সর্বাণী বলেছেন, মাকে 'ডাউন' করাই তোর সবচেয়ে আহ্লাদের কাজ কেমন?

কিন্তু কখনও তো মনে হয়নি সর্বাণীর অপমানিত হয়েছেন। কোন-দিন তো মনে হয়নি কতদূরে চলে গেছে কঙ্ক!

সর্বাণীর স্বভাব, কিছু একটা ভুল করে ফেললে বড় বেশি আলোড়িত হওয়া। হয়তো একটা ভাল মাছ তরকারি রাঁধতে গিয়ে নুন বেশি দিয়ে ফেললেও সর্বাণীর আক্ষেপের বহর ঘুচতে চায় না। বৌমা, একটু জল দিয়ে আর একবার ফোটাব? ··বৌমা আর চারটি আলু সেদ্ধ করে ওর সঙ্গে মিশিয়ে দেব?···বৌমা, দই দিলে নুন কেটে যায় না?

করঙ্ক তখন হেসে হেসে বলেছে, ও নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে কী হবে মা? তোমার 'বৌমা'র বুদ্ধি কোনও কাজে লাগবে না। ও একেবারে বিলকুল ফেঁসে গেছে. 'রিপুকর্ম'র কর্ম নয়।

কিন্তু এখন করঙ্ক বলে উঠল না, ও নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই মা। ও 'রিপুকর্মর' কর্ম নয়।

বলল, তোমার সাধ মেটাতে কাজে লাগাও না ওই অস্বস্তির 'মাল'টি।

মাকে 'ডাউন' করে মজা পেয়েছে কঙ্ক, মাকে হ্যানস্থা করে অবজ্ঞায় সরে যায়নি কখনও! এখন গেল। যেন অনেক অনেক দূরে সরে গেল।

এই কিছুদিন আগেও সমগ্র সংসারটাকে আর তার সদস্যকটাকে সর্বাণী একান্ত নিজস্ব নিকট বলে আহ্লাদে ডগমগ থেকেছেন, সেই গৌরবে বিচ্ছুরিত হয়েছেন, তবে সম্প্রতি হঠাৎ হঠাৎ মনে হচ্ছিল, কেউ কেউ বুঝি দূরে সরে যাচ্ছে। তবু পরম ভরসা ছিল কঙ্ক। কঙ্ক একান্তই তার নিকট নিজস্ব।

নিজেকে যেন সর্বাণীর একটা নির্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত প্রাণী বলে মনে মনে হচ্ছে এখন।

হয়তো কেবলমাত্র এখনকার ঘটনাই নয়, কারণ আছে আরও।... মায়ের কাছে চড় খেয়ে রাগে অপমানে কিছুদিন যাবত 'আলো' নামের টিন-এজার মেয়েটা বাড়ির সকলের সঙ্গেই প্রায় বাক্যালাপ বন্ধ করেছিল, হঠাৎ এক সময় দেখা যাচ্ছে, কোন মাহেন্দ্রক্ষণে 'আমে-দুধে' মিশে গেছে। শুধু চড় খাওয়ার কারণ স্বরূপ জনটাই ওই বাক্যালাপ বন্ধের আওতায় রয়ে গেছে। সর্বাণীর সামনেই সে মায়ের গলা ধরে ঝুলছে, দাদার সঙ্গে যথারীতি বাক্‌যুদ্ধ চালাচ্ছে, 'মৃগাঙ্ক' নামক লোক-টাকেও ক্ষমা-ঘেন্নাও করছে একটু। শুধু সর্বাণীই পরিত্যাগের তালিকায়।

আকাশ? সে তো ক্রমেই আকাশে উঠছে। তার মা বাপই তার নাগাল পায় না।

*　　*　　*

আবেগ সর্বস্ব আর একটু কম বুদ্ধি মানুষদের দুরন্ত ক্ষোভ আর অভিমানটাই আপনমনে অবিরত কথার চাষ করতে করতে ক্রমশই 'রোষ'-এ পরিণত হয়। অন্তত সর্বাণীর ক্ষেত্রে তাই হয়ে চলেছে। কথার চাষটা এই ধরনের 'ওঃ। আমাকে বয়কট! ঠিক আছে, আমার ভারি বয়ে গেল। এত অচ্ছেদ্দা কিসের? যেন একটা নিঃসম্বল বিধবাবুড়ি। এত কী? তোদের খাচ্ছি পরছি, না আশ্রয়ে পড়ে আছি? তা যদি হত তাহলে আরও কত হ্যানস্থা করতিস! মনে রাখিস তোদের বাড়িতে আমি নয় আমার বাড়িতেই তোরা! চিরকাল নিচু হয়ে থাকি তাই! সংসারে সুখশান্তি বজায় রাখতে সবাইকে বড় করে নিজে ছোট হয়ে থেকে থেকে সাহস বাড়িয়ে দিয়েছি সকলের।

রোসো, এবার থেকে নিজের পোজিশান রেখে চলব। মান্যটুকুও যদি নাই দিস তবে আর কিসের জন্যে কী?'

অবিরাম বাক্যস্রোত।

সুখের যোলোকলায় তো আছিস। বাড়িটির ভাড়া লাগে না, বাড়ির কোনও হ্যাপা সামলাতে হয় না। চারটি টাকা খরচ করে হোটেলে থাকার মতন আছিস। তো এসব কথা ভেবে দেখে কেউ কোনওদিন?

মানুষের সৃষ্টিকর্তা তাকে মারবার জন্যে অনেক আয়োজন করে রেখেছেন বাঁচাবার জন্যে শুধু এইটুকু! কেউ কারো নিরুচ্চার বাক্য-ধারা শুনতে পায় না। যদি পেত? কী অবস্থাটি হত পৃথিবীর? একটা অতি ভদ্র ব্যক্তিরও রাগের সময় মনের মধ্যে কী পরিমাণ কটূক্তি উক্ত হতে পারে তা হয়তো অবিশ্বাস্যের পর্যায়ে পড়ে যাবে।

সর্বাণী নিজের পোজিশান প্রতিষ্ঠা করবার মানসে যে সব বাক্যগুলি দেওয়ালকে শুনিয়ে উচ্চারণ করেন সেইগুলোই শুধু অন্যের কানে যায়। কিন্তু সেটাই বা কম কী? যথেষ্টর অধিক।

* * *

হয়তো মৃগাঙ্ক যখন বাজারে বেরোতে যাচ্ছেন সর্বাণী বলে ওঠেন, কী আনবে টানবে বৌমাকে একটু জিজ্ঞেস করে যাও। ওর ছেলেমেয়ের তো আবার আজকাল কিছুই পছন্দ হয় না দেখি!

অথবা হয়তো সেই 'বৌমাকে'ই বলে বসেন তোমার ছেলেমেয়ের রুচি পছন্দ বুঝে রান্নার ব্যবস্থাটা করে দিয়ে যাও বৌমা!···বলেন, কঙ্ক তো আজকাল অফিসে কী নতুন ক্যান্টিন খুলেছে বলে টিফিন নেয় না। সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন। না কি বাড়ির টিফিনে আজকাল আর রুচি নেই।

একদিন সুরভি ক্ষুব্ধ একটু হেসে বলল, আপনার ছেলে সত্যি বলছেন কি মিথ্যে বলছেন, সেটা শুধু ভগবান জানেন? আপনি জানেন না?

সেদিন অবশ্য সর্বাণী স্রেফ যাকে বলে 'ভ্যাঁক' করে কেঁদে ফেলে-

ছিলেন। এবং অতঃপর আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বলেছিলেন, কী জানি। আজকাল কেমন 'আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো' ভাব। কেজো কথা ছাড়া মা বলে ডেকে একটু কথাও কয় না।

সুরভি অবশ্য তখন বোঝাতে চেষ্টা করেছিল, অফিসে এখন কঙ্কর অনেক দায়িত্ব বেড়েছে অনেক ঝামেলাও চলছে নানা কারণে। কিন্তু ছেলের ব্যাপারটা বৌয়ের মাধ্যমে জানতে হলে, সুখ স্বস্তি আসে?

সর্বাণী যদি 'নীরবতা' নামক পদ্ধতিটি গ্রহণ করতেন তাহলে পরিস্থিতি কী হত কে জানে। কিন্তু সর্বাণী তাঁর 'পোজিশন' সম্পর্কে সতর্ক হতে গিয়ে ঠিক তার উল্টো চালটাই দিয়ে বসেন।

আসলে তো ব্যাপারটা সেই। 'স্বভাব'। যেটা নাকি মরলেও যায় না। কথা না কয়ে থাকতে পারেন না সর্বাণী। কথাই তাঁর স্বভাবের বিলাস। কারণে অকারণে কথার ফুলঝুরি ছড়িয়েছেন চিরকাল। হঠাৎ মনের মধ্যে একটা ভাঙন ধরে গিয়ে শৌখিন ফুলঝুরিটাই, মাঝে মাঝে আগুনের ফুলঝুরি হয়ে ওঠে।

কিন্তু সর্বাণীর অভিমানটুকু কেউ বুঝতে চায় না। ভাবে রাগ।

'উঃ। কী রাগী হয়েছেন আজকাল উনি।'

কমবয়সী ছেলেমেয়ে দুটোও নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, দিদা আজকাল যা হয়েছে না? কথা কইতে ইচ্ছে হয় না।

আমি তো কই না। আমি বাবা মার মতো মহৎ হতে পারব না।

আর তোর শাশুড়িটা যদি খুব রাগী হয়?

শাশুড়ির সঙ্গে থাকতে আমার বয়েই গেছে। আজকাল আর কেউ তা থাকে না বুঝলি?

সব রকম কথা না হলেও অনেক কথাই মৃগাঙ্কর কানে যায়। কারণ মৃগাঙ্কর আজকাল বাইরে বেরনোর সময়টা একটু কমে এসেছে। ওই কমে যাওয়ার সূত্রে কোনও সময় সর্বাণীকে সামনে পেলে মৃগাঙ্ক ক্ষুব্ধ উত্তেজিত ভাবে প্রশ্ন করেন, দিন দিন তোমার কথাবার্তা কী হচ্ছে? ঘাড়ে ভূত চেপেছে না কি?

সর্বাণী তাচ্ছিল্যের গলায় বলেন, তা চাপতেও পারে। চিরটাকাল তো ভূতের ব্যাগার খেটে মরলাম। দেখে দেখে বুঝে নিয়েছে বোধহয় ঘাড়টা বেশ মজবুত। চাপবার উপযুক্ত।

আশ্চর্য! সংসারে অকারণ অশান্তি ডেকে এনে লাভ আছে কিছু?

ওঃ। যত অশান্তি ডেকে আনি আমিই। কেমন? মুখে তালাচাবি এঁটে মাঝের মাছখানি হয়ে থাকতে পারি না বলে? এখন তোমার কাছেও আপদবালাই হয়ে গেছি।

'ন্যাবা' হলে লোকে সব কিছু হলদে দেখে।

তাহলে তাই হয়েছে। ন্যাবাই ধরেছে। ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চল।

এখন সর্বাণীর স্বর উদাস!

কিন্তু সত্যিই কি সর্বাণী ভিতরে ভিতরে এমন ছিলেন? এমন মন্দ, আর কুটিল বুদ্ধি?

সে কথা বোধহয় বলা চলে না। হঠাৎ তিনি যেন নিজেকে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবছেন, আর সেই ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে নিঃস্ব আর নিঃসহায় ভাবছেন। স্বামী পুত্রও যদি সর্বাণীর মনটা বুঝতে না পারে কিসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবেন তিনি?

যতই এই নিজেকে নিঃস্ব নিঃসহায় ভাবছেন ততই ভুল 'চাল' দিয়ে বসছেন।

কেউ সর্বাণীকে সম্যক মান দেয় না, এবং সেই না দেওয়ার কারণটি সর্বাণীর নিজের 'খেলোমি' এই ভাবটি পেয়ে বসতেই চালে এত ভুল। অর্থাৎ এখন থেকে আর 'খেলো' হবে না, এই সংকল্প।

তাই এই পরিস্থিতির মধ্যেও সুরভি যেদিন কাছে এসে সহজ ভাবে বলে উঠল, পুজো তো এসে গেল মা, দোকান বাজারে বেরোবেন কবে?

সর্বাণী এই সহজের সঙ্গে সহজ হতে পারলেন না, ব্যাজার গলায় বললেন, আর আমার বেরনো। দিন দিন হাঁটুর যা অবস্থা! খতমই হতে বসেছে।

বাঃ। এদিকে ওষুধ টষুধও তো খেতে চান না।

ওষুধ খেয়ে কী আর বুড়ো বয়েসের বাত সারে বাছা।

বৌ আর বেশি কথা বাড়ায় না। কে জানে কোন কথা থেকে কোন কথা এসে যায়।

অতঃপর ছেলে মার 'হাঁটু প্রসঙ্গ' সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিতের ভঙ্গিতে যথারীতি 'পুজোর বাজার' কল্লে বাড়তি যে মোটা টাকাটা মার হাতে দেয় সেটা দিতে আসে।

মা ঔদাসীন্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বলেন, ও আর আমার কাছে দিয়ে কী হবে? খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তো আর দোকান বাজার ঘুরতে পারব না। বৌমার হাতেই দে।

কঙ্ক অবশ্য বলে ওঠে, ছাড় তো। তোমার থেকে ঢের বেশি খুঁড়িয়ে চলা মহিলারাও বাজার চষে বেড়ান। তোমার বৌমাটি সব বোঝেন?

কেন বুঝবে না? আমার থেকে বেশিই বোঝে। আমার যাওয়া তো শুধু ল্যাংবোট হয়ে যাওয়া।

কথাটা মিথ্যে নয়।

'আধুনিক পছন্দ' সম্পর্কে নিজের ওপর তেমন আস্থা সর্বাণীর কোনও দিনই নেই। সুরভির পছন্দকেই প্রাধান্য দেন। তবে 'ল্যাংবোট' শব্দটা এবারই ব্যবহার করলেন।

ছেলে বলল, তো যা কর প্রত্যেকবার তাই করবে। গাড়ি ফাড়িতেই তো যাবে। দশ দোকান না ঘুরে বেশি হাঁটাহাঁটি নাই করলে।

বলে টাকাটা মার সামনে নামিয়ে রেখে চলে গেল।

হঠাৎ হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে ওঠে।

কী রোমাঞ্চময় সুখ। এই বাণ্ডিলটি ব্যাগে ভরে নিয়ে শাশুড়ি-বৌতে বেরিয়ে পড়ে 'নন্দনকাননে' পৌঁছে যাওয়া।

পরমসুখ শব্দটি বোধহয় ওর মধ্যেই নিহিত থাকে।

দশ দোকান নাই ঘুরলে! আহা সেটাই তো সুখের আসল রোমাঞ্চ।

আসলে সর্বাণীর পুজোর 'দেওয়া থোওয়াটা' একটু সুদূর প্রসারিতই। নিজের দিকে তেমন কেউ না থাকলেও, এবং যারা আছে তারা তেমন যোগাযোগ না রাখলেও, এদিকেই মন ঢালেন সর্বাণী। বাড়ির সকলের ছাড়া সুরভির বাপের বাড়ির দিকে, মৃগাঙ্কর দিকে এখনও যারা সব আছে বছরে একবার তাদের সকলকে স্মরণ করেন সর্বাণী। এও তো নিজেকে বিকশিত করার একটি পন্থা।

হৃৎপিণ্ডটা তো লাফিয়ে উঠবেই। স্বর্গোদ্যানের হাতছানি।

তবু নিজেকে সামলালেন সর্বাণী। হঠাৎ মনে হল, বর-বৌ দুজনেই বলল বটে, কিন্তু যেন বলার জন্যেই বলা। বলার মধ্যে তেমন আগ্রহ দেখা গেল কি? নাঃ। যেন বোদা বিস্বাদ।

তাই সুরভি যখন আবার এসে বলল, কী হল? একদিনের জন্যেও একবার যেতে পারবেন না? বাজারটা এবার দেখতেন!

তখন সর্বাণী মনস্থির করে বললেন, নতুন আর কী দেখার আছে। ফি বছরই তো দেখছি—

এবং টাকাটা এগিয়ে ধরে বললেন, তুমিই দেখেশুনে করো গো—

খুব খারাপ লাগছে কিন্তু—

এও যেন একটা প্রাণহীন কথা! সর্বাণীর অন্তত তাই মনে হল।

অতএব সর্বাণী স্থির থাকলেন।

বললেন, খারাপ লাগার লাগার আর কী আছে? সবই তো জান বোঝ। বলতে গেলে তুমিই তো সব কর। আমার শুধু শখের ঘোরাঘুরি।

বৌয়ের এত সাহস হয় না যে বলে, তা 'শখটা'ই বা একেবারে গেল কেন? চুপ করে সরে যায়।

অথচ সর্বাণীর উত্তরটা অন্য হলে পরিস্থিতি অন্যই হত, তার মানে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলেন সর্বাণী।

তা। সে তো পায়ে।

কিন্তু অলক্ষে আরও একখানা ধারালো কুড়ুলে শান পড়ছিল নাকি সর্বাণীর ঘাড়ে কোপ বসাবার জন্যে ?

অনেকদিন পরে টুলু এল এ বাড়িতে।

ইদানীং একটু পালাবদল ঘটেছে। ভাইয়েরা আর তেমন যখন তখন দিদির বাড়িতে আসে না. বরং দিদিই প্রায় যায় ভাইদের বাড়ি। ...যায় হয়তো তখনই প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে, যখন। হ্যাঁ, এত আলো হাওয়াদার বাড়িটাতেও মাঝে মাঝেই প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে।

অনেকদিন পরে এলেও, স্বভাবগত ভাবেই হৈ-চৈ করে কথা বলে টুলু, কী মেসোমশাই! আপনি যে দেখছি ভীষণ বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন! না না, এ তো ঠিক নয়। কী যে সব ব্যায়াম ট্যায়াম করতেন, তার কী হল ? ছেড়ে দিয়েছেন নাকি ? ...মাসিমা, এসব রাজভোগ টাজভোগ বাদ দিয়ে আপনার নিজের 'স্টক'-এর কিছু বার করুন তো ? কিচ্ছু নেই ? সে কী ? অন্তত আপনার সেই স্পেশাল 'ঝিলিমিলি জিভে গজা ?' যাচ্চলে !

ওরও এই স্বভাব। অহেতুক কথার চাষ করে। দিদির মতো বা দাদার মতো মিতভাষী নয় টুলু।

অতঃপর গিয়ে ধরল ভাগনেকে। এই আকাশ! তোর সব রেডি তো ? তো আগে থেকেই শিখিয়ে রাখি বাপু 'র‍্যাগিং' একটু হবেই। একেবারে পার পাবে না তুমি যাদু! তবে বেশি লড়াকুপনা না করে, বোধহয় প্রথমেই সারেণ্ডার করাই সেফ! আমার এক শালার ছেলে তো তাই বলল। ওই যে যার নামটাম তোর কাছে দিয়ে রেখেছি। সেও গোড়ায় গিয়ে কাঁদতে বাকি—! তবে তাকে ভাল করে বলে রেখেছি। কেউ যেন বেশি কিছু না করে। গিয়েই তার সঙ্গে দেখা করবি!

করঙ্কও যেন একটু বেশি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, সে তো করবেই। একদম অজানা জায়গা, অমন একজন নিকটাত্মীয় পাচ্ছে যখন—

চলতি কথায় অবশ্য বলে, 'মামার শালা, পিসের ভাই, তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই।'....কিন্তু এখন আকাশকে তার বাপ বোঝাল, তার মামার

কোন একরকম শালার ছেলেও 'নিকট আত্মীয়'।

সর্বাণী হাঁ করে এই বাক্যালাপ শোনেন। এসব কিসের কথা ?

মৃগাঙ্ক বিচলিত ভাব।

কিন্তু তিনি কোনও কথা বলেন না, শুধু মঞ্চে দাঁড়ানো কুশীলবগণকে নীরবে নিরীক্ষণ করে দেখেন।

সর্বাণী অতঃপর 'হ্যাঁ' খোলেন, অথবা বোজেন। স্বভাবছাড়া মৃদুস্বরে বলে ওঠেন, আকাশকে কোথায় গিয়ে কী করবার কথা বলছে টুলু ?

টুলু বলে, ওর ওই খড়গপুরের আই আই টি-র হস্টেলের কথাই বলছি মাসিমা। জানেন তো নতুন স্টুডেন্টদের ওপর পুরনোদের 'র‍্যাগিংয়ের' উৎপাত। তাই আগে থেকে শিখিয়ে রাখছি। বাপধন, ঘাবড়িও মত্‌!

মৃগাঙ্ক ছেলের মুখের দিকে তাকান। কিন্তু চোখাচোখি সম্ভব হয় না। সে মুখ অন্যদিকে ফেরানো, আর সেই চোখ জোড়া আনত।

তবু মৃগাঙ্ক প্রায় নৈর্ব্যক্তিক ভাবেই বলেন, আকাশ আই আই টিতে চান্স পেয়েছে ?

হ্যাঁ। কিছুদিন আগে একবার করঙ্ক বাবার কাছে বলেছিল, আকাশের তো খুব ইচ্ছে আই আই টি'তে ভর্তি হয়। এখন দেখা যাক কী রেজাল্ট করে। রেজাল্টের ওপরই তো সবকিছু নির্ভর করে।

তারপর আর কিছু জানা নেই।

'ইচ্ছেটা' তাহলে 'পাকা ফল'-এর পরিণতি লাভ করেছে!

এসব কতদিনে হয় ?

আর হয় এমন নিঃশব্দে ?

আকাশ হঠাৎ বলে উঠল, ছোটমামা তোমার রেই 'ছেলের শালা' না কে তার লেখা কাগজটা খুঁজে পাচ্ছি না। এস তো আর একটু লিখে দেবে—

মনে হল মামাকে প্রায় টেনেই নিয়ে গেল নিজের ঘরে।

কিন্তু মামার বোন ?

সে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু একটা করছে। তবে দেখে মনে হচ্ছে মূক-বধির।

কিন্তু করঙ্ক নামের লোকটার তো এখন আর মূক-বধির ভূমিকা অভিনয় করা চলে না। তাই প্রায় তোতলার মতো গলায় বলে, হ্যাঁ লাকিলি ইয়ে হঠাৎ পেয়ে গেল। খুব একটা আশা ছিল না। তাই ভাবছিলাম একেবারে পাকাপাকি না হলে—

ঠিক আছে। ঠিক আছে। তাতে কী! পেয়ে গেছে তো? তাহলেই হল। বলে মৃগাঙ্ক হঠাৎ কেমন স্খলিত পায়ে ঘরে ঢুকে যান। ধুতির কোঁচাটা যেন চটির ওপর লটপটিয়ে ঘষটে যায়।

আর সর্বাণী?

তিনিও আজ এই মুহূর্তে তাঁর স্বভাব বহির্ভূত কাজই করেন। নিঃশব্দে রান্নাঘরের দিকে চলে যান।

বলা যাবে না মঞ্চের বাকি দু'জন একেবারেই সুস্থির রইল। খুবই অস্বস্তি বোধ করল বৈ-কি তারা! দারুণ অপ্রতিভও হল। কিন্তু তাদেরই বা উপায় কী? বর্তমানে তারাও যে এক কড়া মনিবের অধীনে। 'বস'-এর ভ্রূকুটির তালেই চলতে হচ্ছে তাদের।

আকাশ আর আলো।

এই দুই মনিব এখন তাদের শাসানির তলায় রাখে।

সব কিছুই আগে থেকে হৈ-চৈ করে সবাইকে বলে বেড়াতে হবে, তার কোন মানে আছে? জানই তো কারো পেটে কথা থাকে না।··· হবে কি না হবে, এখন থেকেই পাড়াসুদ্ধ জানাজানি হবে। আর এখন থেকেই হা-হুতাশ শুরু হয়ে যাবে, ওরে বাবা রে, ছেলেটাকে বাড়ি ছাড়া হয়ে থাকতে হবে রে! তোকে ছেড়ে কী করে থাকা হবে রে!···জানতে তো বাকি নেই কিছু।··তোমাদের আবার বেশি বেশি। একটা জামাজুতো কিনলেও দেখাতে ছুটতে হবে। সর্বাণী দেবীর 'কোলের খোকা!'

হ্যাঁ, এই 'কোলের খোকাত্ব' ভাব এদের অসহ্য! মানুষ সাবালক

হবে না? 'গুরুজনের' মানসম্মান বজায় রাখতে হলে খোকামি চালাতে হবে চিরদিন? যতসব পচা সেন্টিমেণ্ট। 'গুরুজন!' গুরুজন বলে মাথা কিনে রেখেছেন?

'গুরুজন' শব্দটাই এদের অভিধানে অপাংক্তেয়।

তা অবাক হবার কিছু নেই। 'বয়সের ধর্ম, নবযৌবনের মদমত্ততা' এসব শব্দ তো চিরকালই আছে! তা ওই মদমত্ততার ভাষা যে কালে যে রকম! 'বড়' হয়েছি, সেটাই সগর্বে ঘোষণা।

ওরা যে শুধুই বাবার মা-বাপের কাছে 'বড়ত্ব'টি জাহির করতে চাইছে তা তো নয়, নিজেদের মা-বাপের কাছেও অবিরত সেই জাহিরের চেষ্টা!

মা-বাপই বা তবে কী করবে? এদেরকে সমঝে না চললে মান-সম্মান নাস্তি! এদের নির্দেশে চলতে না পারলে, শান্তি নাস্তি। অতএব আপন অন্তরস্থ নীতি-টিতিকে ধামাচাপা দিয়ে শান্তি বজায়ের সাধনা।··কী ই বা করবে? অতীতকে আঁকড়ে থেকে 'ভবিষ্যৎকে' হারাবে?

অবশ্য কী থাকবে আর না থাকবে সেও ভবিষ্যতের গুহায়। তবু সাধারণ মানুষ তো সাধারণ রীতিনীতি মেনেই চলে!

ভিতরে কিছুটা ভাঙচুর কি আর হয় না?

অস্বস্তির খোঁচা? বিবেকের কামড়? চক্ষুলজ্জার লজ্জা? তা তাকে সহনীয় করতে 'যুক্তির' ভেলায় চড়তে হয়।

তাই 'সকলকে সন্তোষ সাধনের' চেষ্টাটাই ছিল যার জীবনের নীতি, সেও বলে ওঠে, 'এভাবে আর পারা যায়না। তোমার অফিসের সেই ফ্ল্যাটের কী হলো? আমি পরলোকে গেলে তবে পাবে?

অতএব করঙ্ক নামের ছেলেটাও উঠেপড়ে লেগে সেই প্রাপ্তিকে ত্বরান্বিত করে ফেলে। তবে তার কড়া মনিবের নীতি অনুসরণ করে খবরটা সাত তাড়াতাড়ি চাউর করে না!

কাজেই—

এখনও এই সংসারের মধ্যেকার নিঃশঙ্ক ছুটো সদস্য ধারণা করতে

পারে না, কুড়ুল ফুড়ুলের মতো তুচ্ছ ব্যাপার নয়, মা কালীর খাঁড়ার মতো ভয়ঙ্কর ধারালো একখানা খাঁড়ায় শান পড়ছে—সংসারটার ধড়মুণ্ডু আলাদা করে ফেলবার তালে।

* * *

তবু সেই আলাদা হয়ে যাবার আগে খাঁড়া শানানো পার্টিরও রক্তের মধ্যে ভয়ানক একটা যন্ত্রণা হয়ে চলে নাকি?

সেই অফিসমার্কা বাসটা থেকে নির্দিষ্ট সময়ে নেমে পড়া লোকটার প্রাণের মধ্যে একটা হাহাকার করে ওঠে, বাস থেকে নেমেই সামনের বারান্দায় প্রতীক্ষারত কোন মূর্তিকে দেখতে পাবে না আর।

ইদানীং ছেলেমেয়েদের নানান চাহিদায় একজন হয়তো ঠিক নিয়মিত দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না সর্বদিন, কিন্তু আর একজন থাকে, তার অবসরপ্রাপ্ত জীবনের অখণ্ড অবসর থেকে খানিকটা কাজে লাগিয়ে।

এরপর আর বাবা সন্ধ্যার সময় ওখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকবেন না!

পুরুষের চোখে সহজে জল আসে না এটা হয়তো সত্যি, তবে একেবারে আসে না তা তো নয়। পুরুষ সেটা চটপট সামলে নেবার ক্ষমতা ধরে এই যা!

আর অপরজন?

সে যেন প্রতিনিয়তই অবাক হতে থাকে—এই চিরচেনা জায়গাটার মধ্যে সে আর ঘুরছে-ফিরছে না! এই ঘর এই বারান্দা এই দেয়ালরা শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে, তাদের একান্ত জানা মানুষটাকে হারিয়ে ফেলে! শোবার ঘরের এই দু' দেয়ালধারে আর সুরভির কাপড়ের আলমারি দুটো থাকবে না। থাকবে না দরজার পাশের আলনাটা। সুরভি বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাস্তার ওপারের ওই কৃষ্ণচূড়া গাছটাকে আর দেখতে পাবে না কোনদিন।…কোন কোন দিন এর মস্ত ছাতটায় অন্ধকারে আলশে ধরে দাঁড়িয়ে চৈত্র-বৈশাখের এলোমেলো হাওয়াটাকে সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে করতে উদাস উদাস হয়ে যাবে না।…আর কোনদিনও ছাতের ওই পুবকোণটায় গিয়ে 'সুরঝঙ্কার-এর' নতুন তৈরি

দোতলার কার্নিশটা দেখতে পাবে না।

'সুরঝঙ্কার।'

তাকেও ছাড়তে হবে। অতদূর থেকে আর—

বুকের মধ্যেটা হু হু করে ওঠে।···সেই হু হু করা মনে ভাবতে চেষ্টা করে মৃগাঙ্ক মৌলিক নামের এক বৃদ্ধ নিঃশব্দ একটা বৃহৎ বাড়ির একটা বারান্দায় একটা ইজি চেয়ারে শুয়ে আছেন। ভয়ানক একটা অপরাধ-বোধে বুকটা মুচড়ে আসে!

বাড়িটা বৃহৎ বৈকি! বেশ বৃহৎ!

এই বাড়িটার প্রতিটি ইটকাঠ সুরভি নামের মেয়েটার মুখস্থ।

বিয়ের পর সুরভিকে অবশ্য বেশ কিছুদিন তার শ্বশুরবাড়ির উত্তর কলকাতার সাবেকি একমালি সংসারে কাটাতে হয়েছে। সেটা খুব একটা সুখদায়ক স্থিতি নয়।··শ্যাওলা-পড়া উঠোন। অন্ধকার বাথরুমে শ্যাওলা-ধরা চৌবাচ্চা! রান্নাঘরে আরশোলার বাসা!

সুরভির বাবার অবস্থা খারাপ ছিল না, একমাত্র মেয়ে এবং সুন্দরী মেয়েটাকে খুঁজে পেতে আরও উচ্চমানের একখানা বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন না কি তিনি? কিন্তু হঠাৎ সদ্য বিপত্নীক হয়ে পড়া লোকটা চার-চারটে ছেলেমেয়েকে নিয়ে দিশেহারা অবস্থায় 'বিয়ের যুগ্যি' বড় মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি অন্যত্র পাচার করে দেওয়াই সুবিধে বোধ করেছিলেন। তবে অপাত্রে অবশ্যই নয়। বুঝেছিলেন পাত্রের 'ভবিষ্যৎ' আছে। বাকিটা মেয়ের নিজের ভাগ্য।···বাড়িখানা যেমনই হোক সদ্যমাতৃহারা মেয়েটা একটা পরম আশ্রয়ই পেয়ে গিয়েছিল।

তা তারপর মোটামুটি গেরস্থ ঘরের পক্ষে মেয়ে ভাগ্যটি ভালই ফলিয়েছিল। বর কর্মক্ষেত্রে চেষ্টা এবং নিষ্ঠায় ক্রমোন্নতির পথেই এগিয়ে চলেছে, এবং শ্বশুর অবসর গ্রহণের সূত্রে উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণ মেরুতে চলে এসে নিজস্ব বাড়ির পত্তন করেছিলেন।

এখন দক্ষিণের এই অঞ্চলটি শহরের 'পশ' এলাকার একটি। কিন্তু তখন জায়গাটা এমন কৌলীন্য লাভ করেনি। এখনকার হিসেবে প্রায় জলের দামে পাঁচ কাঠা জমি কিনে ফেলে, নিয়মমাফিক ছাড় বাদ

দিয়ে পুরো জমিটাতেই বাড়ি বানিয়েছিলেন। বড় বড় ঘর চওড়া চওড়া বারান্দা। অহেতুক ফালতু একটু একটু ছোট্ট ঘর। সব ঘরের সংলগ্ন স্নানাগার।

সুরভি বলেছিল, আর কিছু না হোক, এটাই আগে দরকার বাবা। একটা নাইবার ঘর নিয়ে দশজনের কাড়াকাড়ি দেখে দেখে—

তা বাড়ি তৈরির সময় প্রতিটি ব্যাপারেই সুরভির ইচ্ছে পছন্দকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।...বৌমা যা বলে তাই করা হোক। বৌমার কী ইচ্ছে আগে শুনে নাও।...গ্রিলের ডিজাইন? মোজাইকের রং, নকশা ও বাবা বৌমাকে দেখাও।

সর্বাণীর অভিমত চূড়ান্ত বলে গ্রাহ্য করা হয়েছে শুধু রান্নাঘর আর ঠাকুর ঘর সম্পর্কে! সবই দোতলায়! রান্নাটা যে রাঁধুনির হাতে তুলে দেবেন না সর্বাণী, এতে তিনি নিশ্চিত। এযাবতকাল জ্ঞাতিদের সঙ্গে এক হাঁড়িতে থেকে স্বামীপুত্তুরকে মনের মতো করে খাওয়াতে পাননি! নতুন বৌটাকে ইচ্ছে মতো যত্ন করতে পাননি। সেই সবের জন্যেই তো 'নিজস্ব' একখানা বাড়ির এত মূল্য।

মৃগাঙ্ক এবং তস্য পুত্রের পরিকল্পনা ছিল অবশ্য একতলাটা ভাড়া দিয়ে খরচ খরচা কিছু উসুল করা। তবে অবশ্য তখন আর এই প্রায় শহরতলি অঞ্চলে ওর আর কতই বা ভাড়া হত! তৎসত্ত্বেও 'যথালাভ' গোছের মনোভাব। কিন্তু সর্বাণীর প্রবল আপত্তিতে সে ইচ্ছে কার্যকরী হয়ে ওঠেনি। তখন তো নয়ই। এখনও 'অবিশ্বাস্য অফার' পেয়েও নয়।

তখন মানে নাটকের সেই প্রথম অঙ্কে মিতভাষিণী সুরভির পৃষ্ঠপোষকতাও ছিল সর্বাণীর জোরালো হাতিয়ার।

সুরভিও বলেছে, সত্যি বাবা, বাড়ির মধ্যে অন্য একটা পরিবার! কোনো প্রাইভেসি থাকে না। আমাদের তো সেই নিচের তলায় নেমেই পথে বেরোতে হবে ঢুকতে হবে। ইচ্ছে না থাকলেও কথা বলতে হবে তাদের সঙ্গে। আর যদি বাজে ধরনের লোক হয়? কিংবা খুব গায়ে পড়া? সে কিন্তু খুব অসুবিধের।

আর শ্বশুরের ছেলের কাছে বলেছে, এতদিন 'নিজের' লোকদের

সঙ্গে থেকেই দেখলে তো ? গলা খুলে একটু হাসতেও সমীহ। ভাব তো—এই মস্ত সুন্দর বাড়িটাতে শুধু আমরা চারজন, আর ওর ওই ফাউ দুটো। ব্যস। কী চমৎকার রোমাঞ্চময়! এতদিন ঘিঞ্জির মধ্যে কাটিয়ে এসে খোলামেলায় থাকতে ইচ্ছে করছে না ?

'ফাউ' দুটো তখনই এসে গেছে। তবু কী অজস্র খোলামেলা লেগেছে সুরভির। বলেছে আমার যেন এখনও বিশ্বাসই হতে চায় না সবটা 'আমাদের।' 'মনে হয় যেন ভূস্বর্গে আছি। সেই স্বর্গ নষ্ট করতে আছে ?'

এখন সুরভি সেই 'স্বর্গ' থেকে ছটফটিয়ে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। কিন্তু সেখানে কি আবার একধরনের 'ঘিঞ্জি'র স্বাদ পেতে হবে না ? সাড়ে ছ'লাখ টাকার 'থ্রি-রুম ফ্ল্যাট।' নাম আর দাম দুই-ই খুব জমকাল। কিন্তু সেই রুমরা তো স্কোয়ারফুট মাপা! 'বারান্দা' মানে হালকা ব্যালকনি।

তাছাড়া এখন তো আর সেই 'ফাউ'-রা ফাউ মাত্র নেই। তারা স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট পরম আত্মকেন্দ্রিক দুটো আস্ত মানুষ! তবু সুরভি বলেছে, এভাবে আর পারা যায় না। তোমার অফিসের ফ্ল্যাটের কী হল ?

খাঁড়াখানা বসাবার ভারটা 'সর্বাণী দেবীর কোলের খোকা বোধহয় চুপিচুপিই আর একজনের ওপর দিয়েছিল। কে জানে 'রক্তাক্ত' হবার ভয়ে না, সাহসের অভাবে ?

ভারটা নিয়েছিল মিতভাষী বিলু।

বেড়াতে এসে এটা ওটা কথার পর এক সময় আস্তেই বলে উঠল, আকাশটা নেই, তাই বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। আমার কিন্তু মনে হয় মেসোমশাই এখন আপনাদের একতালাটা ভাড়া দিলেই ভাল হয়। এরপর এত বড় বাড়িতে শুধু আপনারা দু'জন বুড়ো মানুষ! খুব সেফ. নয়। যা দিনকাল।

বুড়োমানুষ দু'জন একটু চকিত হলেন।

এরপরে।

এরপরে মানে?

নিরুচ্চার প্রশ্ন।

বিলু কোনোমতে বলে ফেলে, না মানে দিদিরা দমদমে অফিসের ফ্ল্যাটে চলে গেলে তো শুধু আপনারা দু'জনে।

এটা বাংলা ভাষা? না সবাণীর অজানা কোন ভাষা?

দমদমের ফ্ল্যাট শব্দটার অর্থ কী?

তো বেচারা বিলুকেই গোঁজামিল করে যত সম্ভব সংক্ষেপে মানেটা বোঝাতে হয়। করঙ্কদের ব্যাঙ্কে তাঁদের কিছু টপ অফিসারদের জন্যে দমদমের ওদিকে অতি চমৎকার কিছু ফ্ল্যাট বানিয়েছে। এখন সেটা বিলি করছে। করঙ্কর ভাগেও পড়েছে একটা। তা এক্ষুনি যদি গিয়ে দখল না নেয় হাতছাড়া হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে আবার কবে চান্স পাবে কে জানে।

সর্বাণী কেমন বোকাটে ঝাঁঝের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন, নিতেই হবে? বাধ্যবাধকতা?

বিলু একটু হাসে।

বাধ্যবাধকতার কিছু নেই। তবে লোকে তো পাবার জন্যে পাগল হয়ে আছে এই লটটা ফুরিয়ে গেলে আবার কবে কোথায় শুরু হবে কে জানে। এগুলো দারুণ ফ্ল্যাট।

সর্বাণী না হয় বোকা। কিন্তু মৃগাঙ্ক?

তিনি কী বলে অমন ভ্যাবলার মতো বলে উঠলেন, বিনে ভাড়ায় দেবে?

ভাড়া তো নয় মেসোমশাই 'ওনারশিপ!'

মৃগাঙ্ক কি ভাষাগুলোও ভুলে গেলেন। তা নইলে কী বলে বললেন, অফিসারদের তাহলে ফ্ল্যাটগুলো অমনি দিচ্ছে ব্যাঙ্ক?

বিলু এবার প্রায় জোরে হেসে ওঠে, অমনি? তা আর নয়। মাইনে থেকে ইনস্টলমেন্ট হিসেবে মাসে মাসে মোটা টাকা কেটেই নেবে। তাহলেও অনেক সুবিধে দিচ্ছে। ওই ছ'সাত লাখ টাকার

মতো ফ্ল্যাট অন্যত্র এভাবে পেতে হলে সুদ দিতে হত তো! তাতে দাম আরও বেড়ে যেত! সুদটা এরা ছাড় দিচ্ছে, কম সুবিধে! এমন সুযোগ ছাড়া চলে না তো।

মৃগাঙ্ক এখন স্থির আর শান্ত হয়ে যান। বলেন, তাহলে এখানটা ছেড়ে চলে গিয়ে সেই দমদমে না কোথায় থাকতে হচ্ছে?

ওই তো। বেশ দূর হয়ে গেল। ওর এদিকে আর জমি পায়নি বোধহয়।

মৃগাঙ্ক আরও শান্তভাবে বলেন, কিন্তু নেওয়াটা যখন বাধ্যতামূলক নয়, তখন ওর জন্যে শেকড়টা উপড়ে চলে যাবার কী দরকার বিলু? বাড়ি তো রয়েইছে। ও ছাড়া আমার তো আর কোনো ওয়ারিশান নেই।

* * *

তা একথা বিলুও ওদের বাড়িতে তুলেছিল। বলেছিল কিন্তু দিদি, যতই চমৎকার সুন্দর ফ্ল্যাট হোক, তোদের ওই অত খোলামেলা অতবড় বাড়িটা থাকতে— জামাইবাবু ছাড়া ওঁদের তো আর কোন ওয়ারিশন নেই।

কিন্তু সেখানে একা দিদিই উপস্থিত ছিল না, ছিল ছোট বোন রুবি। ছিল মাসতুতো দিদি মীনাদি।

মীনাই বলে উঠল, তুই থাম বিলু! ওনাদের জীবিতকালে তো আর ওই 'ওয়ারিশানের' কথার কোনও মানে হয় না। তার মানে ওনারা যতদিন এই পৃথিবীর মাটিতে সেঁটে বসে থাকবেন ততদিন? সুরভির এই বৌ-গিরি করেই কাটিয়ে চলতে হবে। কোনোদিনই আর গায়ে হাওয়া লাগিয়ে স্বাধীনভাবে নিজে সংসার করতে পাবে না?

সেই সঙ্গে রুবি হি হি করে হেসে বলেছিল, তা সেটা অনন্তকালও হতে পারে। ক্রমশই তো দেখা যাচ্ছে বুড়োবুড়ির জীবনীশক্তি কী বেশি! আশি-নব্বুইয়ের আগে কেউ আর পৃথিবী থেকে নড়তে চায় না।

তা যা বলেছিস। এই তো আমিই তো এখনও এক বুড়ি নিয়ে জ্বলেপুড়ে মরছি। যতো বুড়ো হচ্ছে তত অবুঝ আর স্বার্থপর হচ্ছে।

নিজেরটি ছাড়া আর কিছু বোঝে না। তা সুরভির বাড়ির কর্তা-গিন্নিটি যা ডাঁটো। ওর কপালে এখন বিশ বচ্ছর ভোগান্তি থাকতে পারে। একজন গেলেও অন্যজন তো সহমরণে যাবেন না। তখন আরও হ্যাপা!

হাসির বন্যা বয়েছিল সেখানে।

সেই বন্যার মুখে কি আর বিলুর পরামর্শবাণীটুকু টিকতে পারে?

অতঃপর নানা মন্তব্য, নানা উক্তি।

বেশ তো অন্য ওয়ারিশান যখন নেই-ই, তখন ভাবনারই বা কী আছে? ইটকাঠের বাড়িটা তো আর মাছ দুধের মতো পচে যাবে না।

আর বুড়ো যদি ছেলে-বৌয়ের ওপর রাগ করে তেজ ফলিয়ে মিশনে টিশনে দান করে বসে?

অত আর নয়! বাঙালির প্রাণ বলে কথা! 'ছেলে' বড় জিনিস! তায় আবার বংশধর নাতিও রয়েছে। দেখি তো বেশিরভাগ লোককে, মেয়ে থাকলেও কর্তা কৌশল করে মেয়েকে কলা ঠেকিয়ে বাড়িটি ছেলের নামে উইল করে রেখে যায়।...হ্যা হ্যা হ্যা, এক্ষেত্রে খুব রাগ দেখালে উইল করে নাতিটাকেই দিয়ে যাবে।

অনায়াস অবলীলায় এসব কথা বলে ওরা হেসে গা গড়িয়ে।

সুরভি অবশ্য এসব হাসি-তামাশায় যোগ দেয় না, গম্ভীর হয়ে সরে থাকে। তবু বার বার শুনতে পাওয়া কতকগুলো শব্দ যেন কোথাকার একখানা ফাটলধরা ভেঙে পড়ো দেওয়ালের ভিতটাকে নতুন করে শক্ত করে। · 'বুড়ো হলেই লোকে ক্রমশই অবুঝ আর স্বার্থপর হয়ে ওঠে! ...একজন গেলেই কিন্তু আর একজন সহমরণে যায় না? ··তখন? তখন সেটি গন্ধমাদন পর্বত! ....এ যুগে বুড়োদের আয়ু লোহা দিয়ে বাঁধানো! ···ধরে নাও আরও অন্তত বিশটি বছর ভোগান্তি!' ·

কথাগুলো খুব নির্লজ্জ? রূঢ়? কুরুচিকর?···

হয়তো তাই। তবু অস্বীকার করা যায় না 'সত্য'! বাস্তব সত্য।

* * *

সর্বাণী অবশ্যই চোখকান বোজা নয়। 'আজকাল' 'দিনকাল' 'বাজারের অবস্থা' সবই খবর রাখেন, তবু বোধহয় তাঁর এমন ধারণা

ছিল না, শহরের এত এত মহা মহা লোক, যারা নাকি শুধু একটু 'মাথা গোঁজার ঠাঁই পেতে' অক্লেশে হাজার দুই আড়াইও দিতে প্রস্তুত, তারা স্রেফ ফুটপাথে পড়ে আছে। অন্তত অবস্থা দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।

সর্বাণীর ওই একতলাটি ভাড়া দেবার কথা উঠতেই প্রার্থীর ঝাঁক দেখে এই রকম একটা তুলনা মনে এল সর্বাণীর। ফুটপাথে পড়েছিলেন নাকি ওঁরা?

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল?

না-না।

তেমন কাজ করে বসলে আরও কী হতো কে জানে! এশুধু নেহাত জানাচেনা জন। লোকমুখে খবর পাওয়ার সূত্রে প্রার্থীর তালিকায় নাম লিখে বসেছেন। প্রায় সকলেরই ধারণা, তাঁদের একটি আত্মীয়তার দাবি আছে। কেন নয়? করঙ্কর শালাদের ভায়রাভাইয়ের জামাই অথবা করঙ্কর ভায়রাভাইয়ের মামাতো দাদার শালা, অথবা করঙ্করই অফিসের কলিগদের শালা-সম্বন্ধী মামাশ্বশুর, ভাইঝি জামাই ইত্যাদিরা কি আত্মীয়ের পর্যায়ে পড়ে না?

অনেক প্রার্থী এখন বেছে নাও, কাকে রেখে কাকে ছাড়বে!

করঙ্ক বলে আমার তো মনে হয়, বাবা, আমার অফিসের সেনগুপ্ত'র সেই দিল্লির মামাশ্বশুরকে দেওয়াই সেফ। এতে অন্য সব আত্মীয়-জনেদের মধ্যে একটা মান অভিমানের প্রশ্ন আসবে না। তাছাড়া—ইনি তো আড়াই হাজার পর্যন্ত দিতে রাজি।

আড়াই হাজার!

দুই কি আড়াই এটা ওঁর কাছে কিছুই নয় বাবা! দিল্লিতে মস্ত চাকরি করে এসেছেন বরাবর। এক ছেলে এক মেয়ে! ছেলে আমেরিকায় মেয়ে-জামাই জাপানে। উনি রিটায়ার করে এসে কলকাতায় একটি মনের মতো বাড়ি বানিয়ে থাকতে চান। তো এখানে এসে গুছিয়ে বসতে না পারলে তো সুবিধে হবে না! সেনগুপ্ত তো বলছিল—সল্টলেকে না কি পাঁচকাঠা জমি কেনা আছে। কিন্তু এখন ওঁর ধারণা সল্টলেকে দারুণ ঘিঞ্জি হয়ে গেছে, তাই আরও দেখতে চান। তাই

বাড়ির একখানা খুব দরকার। সামনের মাসেই চলে আসছেন দিল্লি থেকে। কাজেই—মানে তেমন চাপ দিলে হয়তো আরও বাড়াতে পারেন।

এতক্ষণে মৃগাঙ্ক আস্তে বলল, 'চাপ দেওয়ার প্রশ্ন কেন?'

করঙ্ক আজকাল কথা খুব কমই বলে, তবে আজ ঝোঁকের মাথায় একসঙ্গে অনেক কথা বলে ফেলেছে।

বাবাকে এই একটা অভাবিত প্রাপ্তির খবর দিতে পারার গৌরবে আর উল্লাসে একটু যেন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছিল। মনের মধ্যে তো অলক্ষিত একটি বিবেকজনিত কামড় রয়েই গেছে। মা-বাবাকে ফেলে রেখে এভাবে চলে যাওয়া মানে শুধুই যে তাঁদের 'পারমার্থিক' অসুবিধেয় ফেলা, তাও তো নয়, আর্থিক অসুবিধেও তো অবশ্যই অবধারিত। নিজে সংসার পেতে বসলে তো আর এদিকে সেভাবে হাত পৌঁছনো সহজ নয়। তাছাড়া নিজের ফ্ল্যাট বাবদও তো মাসে মাসে মাইনে থেকে কাটা যাবে। অবশ্য বিবেচক ওপরওয়ালা, ফ্ল্যাট বিলির আগেই মাইনেটা একটা মোটা অঙ্কের বাড়িয়ে দিয়েছে। তবু ওখানে আবার 'স্ট্যাটাস' বজায় রাখার একটা প্রশ্নও তো রয়েছে।

নিজেই উত্তেজিত আবেগে অনেকগুলো কথা বলার পর, বাবার ওই স্তিমিত প্রশ্নটায়, লজ্জিত হয়ে যায় করঙ্ক। এবং তখন বলে না, আমাদের দিক থেকে সেকথা ওঠে না। তবে সেনগুপ্ত বলছিল।

মৃগাঙ্ক বললেন, সেটা অবশ্য বলতেই পারে। জানেই তো মানুষের স্বভাব।

এই সময় করঙ্ক আবার সাহস করে বলে ওঠে, তবে এ কথাটা অবশ্য মানতেই হবে বাবা, মার একটা অকারণ জেদে এ পর্যন্ত কত অপচয় হয়ে এসেছে।

মৃগাঙ্ক একটু হাসলেন। তারপর বললেন, 'এ পর্যন্তর' অপচয়ের হিসেব কি শুধু ওইটুকুই কঙ্ক? এক লাইনেই বলে ফেলে শেষ হয়ে যাবার মতো?

করঙ্ক আর হালে পানি পায় না। ভেবেছিল বাবার কাছে একটু সমর্থন পাবে। বাবাও আজকাল যেন হেঁয়ালির ভাষায় কথা বলছেন

হঠাৎ হঠাৎ!

কিন্তু এত বড় কথাটা তো কাউকে না কাউকে বোঝানো দরকার। সর্বাণীর তুচ্ছ জেদে যে কী পরিমাণ লোকসান হয়েছে। এই পনেরো বছর ধরে একতলাটা ফালতু ফেলে রাখা হয়েছে শুনে—যে শুনেছে সে তো প্রায় গায়ে ধুলো দিচ্ছে। শুনে নিজেদেরকে বোকা ভেবে লজ্জাই করেছে। তা মাকে করঙ্ক অন্য ভাবে বলে। এতদিনের ক্ষতির খতিয়ান না দেখিয়ে খবরটা পেশ করে বসে ওঠে, তাছাড়া এই ভদ্রলোককে দেওয়াই সেফ্। ভয় নেই, এ লোক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শেকড় গেড়ে বসে থাকবে না। উঠে যাবেই। নিজস্ব বাড়ি বানিয়ে নিতে যতদিন। উঠে যাবেই।

সর্বাণীও তাঁর স্বভাব বহির্ভূত স্তিমিত গলায় বলেন, তোর মার তো সবই উল্টোপাল্টা। এরপর হয়ত দেখবি 'উঠে যাবে' ভেবেই ভয়ে কাতর হচ্ছে তোর মা।

নাঃ। কোন সময়ই যেন কথাবার্তাকে আর স্বাভাবিক খাতে আনা যাচ্ছে না।

একবার মাকে বলল, আচ্ছা মা, সেই ফ্ল্যাটটা তে নতুনই, আর নিজেদেরও। তো প্রথমদিন যাবার সময় কী সব পুজো টুজো করতে হয় না?

সর্বাণী একটু হেসে বলেন, ওসব 'সেকেলেপনা' মানলে অবশ্য করতে হয়।

বাঃ। সেকেলেপনা কী? যারা যারা এসেছে, সকলেই তো না কি—তাছাড়া—

বলতে যাচ্ছিল, তার শালার বৌরা খুব হৈ হৈ করছে—সেদিনের উৎসবে মস্ত একটা ভোজ খাওয়া যাবে বলে—

মা বলল, 'তাছাড়া' কী?

না মানে, কিছু একটা বোধহয় করাই নিয়ম, সবাই বলছিল। নাকি বাড়ির সকলে একসঙ্গে গিয়ে প্রবেশ করতে হয়, পুজো টুজোও করতে হয়। তুমি তো সবই জান বাবা।

সর্বাণী বলেন, 'সব জানা' বলে কোন কথা নেই রে বাবা। তবে জানি এসব। তোরা মানলে হতেই পারে।

তা হলে তো পাঁজি টাজি দেখতেও হয়।

তা হয়। বলিস তো দেখব।

হ্যাঁ, এইভাবেই কথা বলেন আজকাল সর্বাণী। নিস্পৃহ নির্লিপ্ত ভাব। মনের মধ্যে কী আর এসব চিন্তাগুলো আসছে না? খুবই আসছে। কিন্তু আগ বাড়িয়ে বলতে যাবেন কেন? ওরা যদি উড়িয়ে দেয়। ছেলেমেয়ে.দুটির যা কটাকট কথা হয়েছে। তা'ছাড়া বৌ তো এ নিয়ে টুঁ শব্দটি করছে না? একবারও তো বলতে পারত, মা কী সব করতে টরতে হয় করুন।

হ্যাঁ, এই রকমই ভাবেন সর্বাণী।

ভেবে দেখেন না সুরভির মধ্যেও রয়েছে একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। এ বছরের 'পূজোর বাজারে'র প্রসঙ্গর অভিজ্ঞতাটি তো রয়েছে তার। যদি সর্বাণী বলে বসেন, আমি আর কী বলব? তুমি তো সবই জান। যা বুঝবে করবে।...তাহলে?

নাঃ। নীরবতাই শান্তি রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়।

তবু এখানের শিকড়টা ছিঁড়ে অন্য মাটিতে রোপিত হতে যাবার জন্যে গোছও তো করতেই হচ্ছে।

নাচতে নেমে তো আর ঘোমটা দেওয়া চলে না।

লরি ডেকে জিনিসপত্র নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। অবশ্য সব কিছুই কি আর নিয়ে যাওয়া সম্ভব? সেই ছিমছাম সুন্দর ছবির ফ্ল্যাটে এত ধরবে কোথায়? আর জঞ্জালের স্তূপের মতো বসিয়ে রাখলেই বা সৌন্দর্য কোথায়?

আলো তো কেবলই বলছে, ও মা! এই বিচ্ছিরিটা তুমি ওখানে নিয়ে যাবে মা? ভেবে দেখেছ কী রকম দেখাবে?...ইস! তোমার এই আলনা আর বুককেসটি যখন লরি থেকে নামবে, দেখে অন্য ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে ভিড় জমে যাবে।

কিন্তু তার মধ্যে কী মন কেমনের সুর একটুও বাজছে না?

হয়তো বাজছে। হয়তো মাঝে মাঝে এক একবার কোনো কোনো জায়গাটা দেখে মনটা একটু উদাস হয়ে যাচ্ছে না, বুকটা একটু ধক্ করে উঠছে না, তা নয়। তবু আলোর জীবনে যে এখন এক অলৌকিক অভাবিত আলোর ঝলকানি। হ্যাঁ অলৌকিকের মতোই সেই ঘটনা। আলোর ভাষায়—যা নাকি 'ভাবা যায় না।'

আলোর বাবার ফ্ল্যাটটির ঠিক পাশের ফ্ল্যাটটির মালিক হয়ে আসছেন নাকি আলোর প্রাণের বন্ধু 'তিন্নি'র ছোটমামা। তার মানে, অহরহ আলোর একদম পাশাপাশি—তিন্নির সেই 'পল্টনদা!'

'ভাবা যায় না' ছাড়া আর কী?

আর আকাশ?

সে তো এখন প্রায় অন্য গ্রহের জীব।

সপ্তাহে তু'সপ্তাহে এক-একবার আসে বটে খড়্গপুর থেকে দেড় দিনের জন্যে, তবে যে ক'ঘণ্টা কলকাতায় থাকে, নেহাত 'গভীর রাতটুকু' বাদে সর্বদা বন্ধু পরিবেষ্টিত হয়ে। হয় 'বাড়িতে বন্ধু' নয় 'বন্ধুর বাড়ি!' দেড়দিনের মধ্যে হয় দেড়বেলা অন্যত্রই খেয়ে আসে। বলে 'বন্ধুর মা জোর করে খাইয়ে দিলেন।'

সর্বাণী নিজের কথা উল্লেখ করেন না। হয়তো বলে ওঠেন, আর তো মা যে হা-পিত্যেশ করে বসে রয়েছে।

'আশ্চর্য! তা কী করা যাবে? ভদ্রতা বলে একটা কথা নেই?

কথাটা তো ঠিকই। আছে বৈ কি! যে জিনিসটা কেবলমাত্র বাইরের জন্যে।

তা যে 'কথা'টি বাইরের লোক সম্পর্কে থাকে সেটা যে বাড়ির লোক সম্পর্কেও থাকতেও হবে, এমন কোনো মানে নেই। কাজেই আকাশকে যখন জানানো হয়েছিল তাদের নতুন ফ্ল্যাটে যাবার সময় 'সবাই মিলে' একসঙ্গে যাওয়া বিধি, অতএব তাকে তু'দিনের ছুটি করিয়ে নিয়ে কলকাতায় চলে আসতে হবে, তখন আকাশ অনায়াসেই বলেছিল, 'অসম্ভব!' ওইদিন আমাদের 'স্টুডেণ্ট ইউনিয়ন'-এর মিটিং! তুদিন ছুটি নিয়ে চলে আয়। অ্যাবসার্ড কথা! 'একসঙ্গে প্রবেশ।

যত্তোসব পচামার্কা কুসংস্কার ! কোনও মানে হয় না !

অতএব আর কী করা !

সুরভির যদি মনে হয়ে থাকে আকাশকে বাদ দিয়ে অনুষ্ঠান ! সে অনুষ্ঠানের কোনও মানে হয় না। সেটা মনের মধ্যেই রেখে দিতে হয়েছে তাকে। সে তো সর্বাণীদের যুগের নয় যে, বলে ফেলে খেলো হয়ে মরবে !

দিন রাত ঘণ্টা মিনিট নিজের নিয়মে আবর্তিত হয়ে চলে। চলে, —আপন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে পৌঁছে পাক খায়। এবং তার চাকায় বাঁধা মানুষগুলোকে 'অমোঘ'-এর শিকার করে চলে ! অথচ দৈনন্দিন চাকাটাও ঠিক তালেই চলতে থাকে।

শেষ অবধি ! সেটা আরও অমোঘ।

* * *

করঙ্কর বুদ্ধিমান হয়ে ওটা সদ্য তরুণ পুত্রটি 'যত্তোসব পচামার্কা' কুসংস্কারকে তাচ্ছিল্য করুক, সে জিনিসটার শিকড় যে অতীব গভীরে তা বুঝতে সময় লাগবে তার।

করঙ্ক বলল, ভেবেছিলাম সেনগুপ্তর ওই আত্মীয় আগেই চলে আসবেন। একটু নিশ্চিত হওয়া যাবে। সেপ্টেম্বর থেকেই তো ব্যবস্থা, কিন্তু হচ্ছে না !

কথাটা মা বাবা দু'জনকে উদ্দেশ্য করেই। 'আগেই' মানে, তাদের এ বাড়ি থেকে রওনা দেবার 'আগে'। তাহলে অবশ্য তার পক্ষে নিশ্চিন্ততা। কিন্তু ওই ! 'হচ্ছে না।'

কেন হচ্ছে না ?

ওই আর কী, যা করঙ্কদের তাই ওনাদেরও !

ভাদ্র মাস।

দিল্লি থেকে তো এসে গেছেন। সেনগুপ্তর ওখানেই রয়েছেন ক'দিন ! কিন্তু ওই 'ভাদ্রমাস !'

হলেও ভাড়া বাড়ি, তবু এসে কিছুদিনের জন্যে সংসার পেতে বসতে হবে যখন। বরং ভগ্নি জামাইয়ের বাড়িতেও ঠেসে গুঁজে থেকে

যাবেন কদিন।

লোকটা নিজে চিরকাল দিল্লিপ্রবাসী। সর্বদা ওপরমহলে ঘোরা-ফেরা। ছেলে-বৌ আমেরিকা এবং মেয়ে-জামাই জাপানবাসী। কর্তাগিন্নি দু'জনে বেশ কয়েকবার ঘুরেও এসেছেন সে সব দেশ, তবু জানিয়েছেন—ওই 'ভাদ্রমাস' না কী! এটাই মুশকিলে ফেলেছে। মিসেস এর মধ্যে যেতে রাজি হচ্ছেন না। অতএব ওই উনিশে সেপ্টেম্বর কী যেন শুভ দিনটিন আছে।

অর্থাৎ সুরভিদেরও ও সেদিন 'যাত্রা' দিবস।

'শুভ দিন' আছে বলেই তো!— শুভ যাত্রার দিন ধার্য হয়েছে।

অতএব করঙ্ক নামক পরিবেশ পরিস্থিতির স্রোতে ভেসে যাওয়া ছেলেটা বলে, আশ্চর্য! ভাবিনি ওনারাও এইসব সেকেলে কুসংস্কার মানেন! মুশকিল হল। ভেবেছিলাম এসে পড়লে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

* * *

কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়া কি এতই সোজা?

অফিস যাবে বলে বেরিয়েই হঠাৎ সদর দরজাটা ধাঁই করে বন্ধ করে বাড়ির মধ্যে ফিরে এসে করঙ্ক চাপাগলায় প্রায় আর্তনাদের সুরে ডেকে ওঠে, বাবা!

ছেলের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়া দেখবার জন্যে, অভ্যস্থ নিয়মেই সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন সর্বাণী 'দুর্গা দুর্গা' বলতে। আজও ছিলেন, আর ভাবছিলেন, ভাগ্যিস ভাদ্রমাসটা পড়ে গেছল, তাই তবু আরও কটা দিন বাড়তি হাতে পাওয়া গেছে ছেলের এই যাত্রাকালে 'দুর্গা' নাম উচ্চারণ করার জন্যে।

হঠাৎ ছেলের ওই ডাক শুনে চকিত হন।

মৃগাঙ্কর দিকে তাকিয়ে দ্রুত নিচে নেমে আসেন।

মৃগাঙ্কও আসেন।

কী হল?

বাবা! সেই অনেকদিন আগের 'সেই' লোক দুটো।

সেই লোক দুটো!

সেই যে প্রাণকেষ্টর!

মৃগাঙ্ক আস্তে বলেন, আবার এতদিন পরে কী বলতে এসেছে?

জানি না। ওদের আসতে দেখেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে সরে এসেছি।

কী আশ্চর্য! কী বলতে চায় শুনলে না?

হ্যাঁ! তাই শোনবার জন্যে দরজা খুলে 'এসো ভাই' বলে ডাকি, আর বুকে একখানা ছোরা বসিয়ে দিক!

ছোরা! ওদের হাতে ছোরা ছিল নাকি?

হাতে না থাক, সঙ্গে থাকাটা নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়।

কিন্তু কেনই বা খামোকা হঠাৎ এই বেলা ন'টার সময় বুকে ছুরি বসাতে আসবে?

কেন সেটা মনে মনে ভাবুন! আমার তো ওদের দেখেই মনে হল, একটা হিংস্র মনোভাব নিয়ে এসেছে!

মৃগাঙ্ক একটু হতাশভাবে বলেন, কিন্তু কেন বল্ তো? সেদিন তো ওদের দেখে তেমন কিছু মনে হয়নি! নিরীহ নিরীহই লেগেছিল।

এখন নেমে এসেছে সুরভিও।

আস্তে বলে, প্রথমে তো নিরীহর ভাবই দেখায় সবাই! পকেটমাররাও কাছে এসে বলে, 'দাদা! আপনার ঘড়িতে কটা বেজেছে?'

মৃগাঙ্ক হেসে ফেলেন, তা বটে! কিন্তু দরজাটা তো খুলতেই হবে।

খুলতেই হবে?

কী আশ্চর্য! হবে না? কঙ্ককে অফিস যেতে হবে না?

—'অফিস!' হ্যাঁ ওই আর একটা অমোঘ শব্দ আছে বটে জীবনের অভিধানে! অফিস! যার মূল্য প্রাণের থেকে কিছু কম নয়! হয়তো বা বেশি।

সুরভি আস্তে বলে—

এই একতলায় রান্নাঘরের পেছনের প্যাসেজের দরজাটা দিয়ে

বেরিয়ে যাওয়া যায় না ?

সর্বাণী বলে ওঠেন, ওই জমাদার আসা গলিটা দিয়ে ?

জমাদার ! ওঃ। তা-ও তো বটে। সে তো অসম্ভব।

ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে সুরভির মুখে।

মৃগাঙ্ক হঠাৎ একটু জোরের গলায় বলে ওঠেন, সবাই মলে কী পাগলামি হচ্ছে ? তোমরা থাকো আমি দেখছি—ইচ্ছে করলে আবার দরজাটায় খিল লাগিয়ে দিও !

বলে খট করে ছিটকিনিটা নামিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েন !

কে তবে আবার সেই দরজায় খিল লাগিয়ে নিজেকে নিরাপদ করতে চাইবে ? মৃগাঙ্কর স্ত্রী ? পুত্র ? অথবা তার বধূ ? পৌত্রী অবশ্য বাড়ি নেই। আগেই স্কুলে বেরিয়ে গেছে। থাকলে কী হত বলা যায় না।

এরা কী দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকবে অতর্কিত আক্রমণের একটা তীব্র আর্তনাদের জন্য। তা তো হয় না।

তুই থাক, আমি দেখছি—

বলে সর্বাণী এগিয়ে যান।

করঙ্ক বলে ওঠে, আঃ সরো তো ? তোমরা ভেতরে যাও !

যেন একটা নিশ্চিত 'বিপদের' প্রস্তুতি।

সকলের চোখের সামনেই যেন প্রকাশ্য পথে দিনের আলোয় একখানা ছুরি ঝলসে ওঠার দৃশ্য !

কেন ? কেন আর ? আতঙ্ক ! সন্দেহ ! যার মূলে কাজ করছে মানুষ সম্পর্কে ভয় অবিশ্বাস, আর একটা অপরাধবোধ।

না, লোক দুটোর কারো কোনও হাত পিঠের দিকে নেই। দু'জনেই দু-হাত জোড় করে কচলাচ্ছে।

পরনে সেই ময়লা লুঙ্গি, ছেঁড়া গেঞ্জি কাঁধে চিরকুট গামছা !

অর্থাৎ এটাই ওদের স্বাভাবিক সাজ।

আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য হঠাৎ 'খুন করে' ফেলবার মতো কোনও হাতিয়ার দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু হাতিয়ারই কি দরকার হয় সব সময় ?

একজোড়া হাত ও কি, 'হাতিয়ার' হয়ে উঠতে পারে না যদি হু'খানা কাছাকাছি সরে আসে? সরতে সরতে আরও কাছে!

এখানে তো আবার হু'জোড়া হাত!

তবু বাবাকে ওভাবে লোক দুটোর সামনে যাকে বলে অকুতোভয়ে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু লজ্জিত হতেই হয়। করঙ্কও অতএব এগিয়ে যায়। এবং বেশ চড়াগলায় বলে ওঠে ব্যাপারটা কী? অ্যাঁ?

চড়া গলা সাহসের দ্যোতক!

লোক দুটো অবশ্যই সাহসী নয়। অন্তত এখনও পর্যন্ত নয়। তাই ওরমধ্যে একজন মিনমিনে গলায় বলে, আজ্ঞে কিছু না দাদাবাবু। বাবুকে শুধেছিলুম প্রাণকেষ্ট এর মধ্যে এয়েছেল কিনা।

না, দু'জনেই দুটো হাত কচলাচ্ছে।

অতএব আরও চড়া হওয়া যায়, প্রাণকেষ্ট? প্রাণকেষ্ট মানে? প্রাণকেষ্ট কে?

আঁজ্ঞে না! কেউ না। মানে একটা লোক! সেই কতদিন যেন আগে বলেছেল, পুলিশের তাড়া খেয়ে নাকি এই বাড়িটার মদ্যে সেঁদিয়ে এয়েছেল। আর একখান পুঁটুলি না কি এখেনে কোতায় থুয়ে গেছল। তাই—

বাবা! তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব রাবিশ গল্প শুনছ! 'এখেনে থুয়ে গেছল!' গুলতাপ্পির আর জায়গা পাওনি? বলি, এ গল্প তো আগে একবার করে গেছলে!

আঁজ্ঞে তা গেছলুম বাবু! তা তদবধি তো আর লোকটাকে দেখি নাই।...কেউ কেউ বলছেল, হয়তো খুন হয়ে গ্যাচে। কেউ বলছিল পুলিশের হাতে ধরা পড়ে চালান হয়ে গেচে! তো এযাবত তো নিখোঁজ ছেল! এক্ষেত্রে হটাৎ শুনতেচি গারদ থেকে ছাড়া পেয়ে—

থাম! তোমাদের প্রাণের বন্ধুর কাহিনী শোনবার সময় আমাদের নেই। সরে পড়!

এখন আর সেই চাটার্ড বাসই ভরসা নয়। ট্যাক্সি করেই অফিস যাওয়া চলছে। ফেরার সময় ব্যাঙ্কের একখানা গাড়ি জনাকয়েক

অফিসারকে চাপিয়ে ছাড়তে ছাড়তে আসে। অবশ্য ভবিষ্যতে নিজস্ব গাড়ির আশ্বাস আছে।

মৃগাঙ্ক এখন পিছনের লাইনে, তার পুত্রই এখন 'অকুতোভয়ের' ভূমিকায়।

আজ্ঞে দাদাবাবু 'বন্ধুটন্ধু' কিছু না। ওর কাচে আমি কিচু পাই। মহা বদমাশ লোক বাবু! পাওনা টাকা দেয় না। তো এই দু' আড়াই বছর নাগাদ তো কোন হদিশই নাই। তবে সংপ্রাত্তি শুনতেচি নাকি গারদে ভরা ছেল! অ্যাখোন ছাড়া পেয়েচে। তবে লকআপে থাকতে পুলিশের ঠ্যাঙানি খেয়ে নাকি কোমরের হাড় গুঁড়ো হয়ে গ্যাচে! 'কেরাচ' ভেন্ন হাঁটতে পারে না। তা খোঁজ নিতেছিলুম এখেনে এয়েছেল কিনা! বলেছেল তার 'যথা সব্বোস্বো' নাকি এখেনেই কোতায় থুয়ে রেখে গেচল!

করঙ্ক এখন ফেটে পড়ে, গেট আউট! গেট আউট! ধান্দাবাজির আর জায়গা পাওনি? তোমাদেরই পুলিশে ধরিয়ে দিইগে চল!

হাত কচলানোটাই যখন চলছে, তখন সাহসে ফেটে পড়া যায়।

কিন্তু এখন 'পুলিশের' নাম শুনেই লোক ছুটে। ঈষৎ রুখে ওঠে কেন বাবু?—পুলিশের কতা ওটে কেন? আমরা আপনার ঘরে চুরি-ডাকাতি করতে সেঁদিয়েচি? হচ্ছেল প্রাণকেষ্টর কতা। সে যা বলেছেল তাই বলতেচি! নিব্যাস করে বলেছেল, এই বাড়িতেই, লোডশেডিংয়ের আঁদারে কোনখানে যেন তার সব্বোস্বো থুয়ে গেছল!

মৃগাঙ্ক হঠাৎ ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন, ওরে, তোর যে অফিসের খুব বেলা হয়ে গেল! দ্যাখত বাপু, তোমাদের একটু সময় অসময় জ্ঞান নেই? কাজের সময় এই ঝামেলা! তো তোমাদের সেই প্রাণকেষ্টকে বোললে—তিনি যেন তাঁর 'কেরাচে' চেপেই একবার এ বাড়িতে এসে খুঁজে যান। যদি পেয়ে যান তার যথা সব্বোস্বো!

হঠাৎ বাবার এই ব্যঙ্গাত্মক দুঃসাহসিক কথায় কেন কে জানে, নিজেকে ভারি অপদস্থ লাগে করঙ্কর। মনে হয় করঙ্কর সাহসীর ভূমিকাকে যেন ইচ্ছে করেই নস্যাৎ করে দিলেন মৃগাঙ্ক।

এগিয়ে গেল রাস্তার দিকে। ট্যাক্সির জন্যে তাকাতে লাগল।

লোক দুটো আর একটু দাঁড়িয়ে থেকে বলে, তাহলে ওর সাতে দ্যাকা হলে, তাই বলব বাবু?

দ্যাখা হলে? দ্যাখা হয়নি?

মৃগাঙ্ক মৃদু হেসে বলেন, তাই বোল। দ্যাখা হয়ে যাবে! 'কেরাচে' চেপে আর কতদিন গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াবে? আচ্ছা তোমরা তাহলে এখন এস।

আভূমি সেলাম করে চলে যায় লোক দুটো।

দরজাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে মৃগাঙ্ক ঘুরে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বলেন, 'দ্যাকাটা হলো বলে। কাছে-পিঠেই তো আছে কোথাও!

সর্বাণী এতক্ষণে দুর্গানাম বন্ধ করে বলে ওঠেন, তার মানে দ্যাখাট্যাখা হয়েছে?

তবে আবার কী? সেই ব্যাটা প্রাণকেষ্টই চর পাঠিয়ে খোঁজ নিয়েছে, এত বোঝাই যাচ্ছে।

সুরভি বোধহয় অপমানহত স্বামীর মুখটা দেখে থাকবে! তাই এখন ঈষৎ রুষ্ট এবং ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে, সেই লোককে আপনি ইচ্ছে করে বাড়িতে আসতে বললেন বাবা?

মৃগাঙ্ক গভীর গলায় বলেন, না বলে উপায়?

তার মানে আপনি তার কাছে স্বীকার করবেন, তার সেই পুঁটুলির কথাটা?

মৃগাঙ্ক উত্তেজিত হন না। সহজভাবেই বলেন, সেও বা না করে উপায় কী বৌমা? কতদিন আর আমি সেই হতভাগা প্রাণকেষ্টর পুঁটুলি বুকে বয়ে বসে থাকব? আমাকে তো বাঁচতে হবে!

তার মানে সেই ক্রাচে হাঁটা, জেল খাটা, বদমাশ লোকটার হাতে —মানে সেটাই ঠিক কাজ হবে মনে হচ্ছে আপনার?

কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক সেটাই কি সবসময় বোঝবার ক্ষমতা আছে আমাদের বৌমা? তবু—'ন্যায্য অন্যায্য!' 'বিশ্বাস সততা', 'সত্যবোধ মূল্যবোধ', এইরকম কতকগুলো কালতু শব্দের পোকা তো

মাথার মধ্যে বাসা বেঁধে বসে আছে, সেই অজ্ঞান কাল থেকে! জ্ঞানের ধোঁয়া দিয়ে দিয়েও, তাদেরকে তো বাসাছাড়া করে উঠতে পারা যায় না!...

সুরভি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলে, আমার কিছু বলার নেই। তবে এটা জেনে রাখবেন বাবা এই লোক দুটোকে যত নিরীহ ভাবছেন, তত নিরীহ কিন্তু নয়।

'নিরীহ ?' নিরীহ আবার কে ভাবতে গেছে ওদের বৌমা ? পাগল হয়েছে ? দেখেই তো মালুম হচ্ছে, ব্যাটারা একের নম্বরের ঘুঘু।

সুরভি এখন তার সুচিন্তিত মতামতটি বেশ তীক্ষ্ণভাবেই ব্যক্ত করে, আপনার জিনিস আপনি যাকে ইচ্ছে দিতে পারেন বাবা! তবে একটা কোমর-ভাঙা খোঁড়া লোকের হাতে অতগুলো টাকা ধরে দিলে লোকটা 'খুন' হয়ে যাওয়াও বোধহয় অসম্ভব নয়।

বলে, সুরভি একবার তার ওই একচক্ষু হরিণের মতো শ্বশুরটির দিকে তাকায়। ওঁর ওই 'সত্য সততা, ন্যায়বোধ মূল্যবোধ' ইত্যাদি পোকায় ভর্তি মগজটির মধ্যে এই প্রায় নিশ্চিত সম্ভাবনাটি কি ধরা দিচ্ছে না ? মহত্ত্ব দেখাতে গিয়ে একটা লোকের খুন হওয়ার কারণ হয়ে পড়া কি বিশেষ বুদ্ধিমানের কাজ ?

মৃগাঙ্কও ওই তো সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ানো তাঁর পুত্রবধূর মুখের দিকে তাকান।

তারপর গাঢ় গলায় বলেন, মূলেই একটা ভুল করছ বৌমা! টাকাটা 'আমার' নয়। আর সেটা তোমাদের মনে না থাকার কথা নয়। আমি শুধু বোকার মতো সেটাকে আগলে মরেছি, সামলে মরেছি। কারণটা তো বললামই! ওই পোকারা। এ যুগের জ্ঞান বিজ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যা যাদের জড় উচ্ছেদ করে ফেলবার তালে উঠে পড়ে লেগে সাকসেস হতে হতে এগিয়ে চলেছে! কিন্তু কোনও কিছুরই তো জড় সহজে মরে না। সময় লাগে!...ওঁ হ্যাঁ, এটা তুমি ঠিকই বলেছ, লোকটা খুন হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়! কিন্তু অহরহ পথে ঘাটে এমন কত শত শত খুনের ঘটনা তো ঘটেই চলেছে বৌমা! আমি আর কাকে সামলাতে পারছি! আর

কাকেই বা চিরকাল তার হাত থেকে আগলে রাখতে পারব? তবে—

একটু যেন হাসলেন? বললেন, তবে নিজের হাতে নিজেকে খুন করে বসাটা তো সামলানো দরকার!

* * *

কঙ্কর শুনে প্রথমটা প্রায় ইলেকট্রিকের শক খেল।

আজই? ভল্ট থেকে বার করে এনে?…নাঃ। বলবার কিছু নেই।

'বলবার কিছু নেই' বললেও, বলল, তোমার বিবেচনার ওপর কথা বলা চলে না বাবা। তবু—দিয়ে দেবার সময় সাক্ষী টাক্ষী কিছু রেখেছিলে?

সাক্ষী? সাক্ষী আবার কোথায় পাব আমি?

একা এসেছিল?

তবে আবার কী? স্রেফ চোরের মতো চুপিচুপি।

আর তুমি তাকে—! ঠিক আছে! এরপর যদি দারুণ একটা কিছু ঘটে, প্রস্তুত থেক।

কিন্তু কী ঘটবে বল তো? যাকে বলে পাই পয়সাটি পর্যন্ত গুনে পেয়ে গেল। বলতে গেলে জলে পালানো মাছ হাতে পেয়ে গেল। ওঃ। কী প্রণামের ঘটা! যাকে বলে সাষ্টাঙ্গ!

সে তো করবেই। আর তুমি ওই আহ্লাদটুকুর আশাতেই—আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি, 'পাওয়াটা' ও চেপে যাবে। গিয়ে দলের লোকদের বলবে, বাবুরা দিল না।

এবার মৃগাঙ্ক হঠাৎ বেশ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, ভাগ দেবার ভয়ে বলতেই পারে। সেটাই স্বাভাবিক। তাতে আমার কী? দলের লোকেরা আমায় ফাঁসি দেবে? তাদের সাক্ষী রেখে গচ্ছিত রেখেছিল আমার কাছে?

ঠিক আছে। আর কিছু বলবার নেই!

মৃগাঙ্কর এখন স্কুলগার্ল নাতনি প্রথমে বলল, অ্যাঁ! তারপর বলল, ধ্যাত! ভাগ!…তারপর বলল, চমৎকার!!

আর সব শেষে বলল, দাদু! তোমার জবাব নেই!

কিন্তু অনেক শেষে?

যে মানুষ তার চিরকালীন প্রগলভত্ব হারিয়ে প্রায় মূক হয়েই থেকেছে সারাদিন?

রাত্রির আকাশে, হঠাৎ কেঁদে ফেলে বললেন, ওই লক্ষ্মীছাড়া হতভাগাটাকে আবার তুমি একশোবার সাবধান করতে বসলে। আবার ঘটা করে জল খাওয়ালে—

বাঃ। একটা মানুষ 'পিপাসা পেয়েছে' বলে বসল, জল না দিয়ে উপায়? ঘটাপটা কী দেখলে? শুধু জলই তো। তো—

আসছে জন্মে চাতক পাখি হতে বল না কি?

তোমার হাসি আসছে? ওই লক্ষ্মীছাড়াটা—'শনি' হয়ে ঢুকে এসে, আমার অমন সোনার সংসারটা—

মৃগাঙ্ক গম্ভীর হলেন।

বললেন, ভুল কোর না সর্বাণী! ও তো 'নিমিত্তমাত্র!'…'শনি' বাইরে থেকে এসে ঢোকে না। ভেবে দেখ ওই 'প্রাণকেষ্টর পুঁটুলি' প্রাপ্তির আগে কেউ কি আমরা খুব 'অভাবি' ছিলাম?